ইতিহাসের দিকে ফিরে

ছেচল্লিশের দাঙ্গা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

র‍্যাডিক্যাল

কলকাতা

সূচি

সম্প্রীতির কলকাতা

রসিদ আলি দিবস
(১০-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)
হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-যুবকদের
কলকাতায় বিশাল মিছিল।
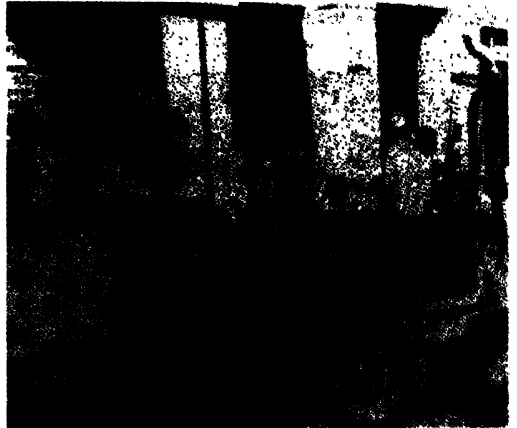
প্রতিবাদমুখর কলকাতা
(২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)
নৌবিদ্রোহের সমর্থনে কলকাতায়
৫০০ জন জাহাজীর ধর্মঘট এবং
চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ-এ জীপে
আগুন।

সম্প্রীতির কলকাতা

১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই ভারতব্যাপী ডাক ও তার সাধারণ ধর্মঘটে কলকাতায় অভূতপূর্ব সাড়া—এতে যোগ দেয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ১৬ লক্ষ কারখানা-শ্রমিক, অফিস কর্মচারী, ছাত্র ও সাধারণ নাগরিক। সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে পরের দিন (৩০ জুলাই) কোন সংবাদপত্র বের হয়নি।

হিংসার কলকাতা

অগাস্ট ১৯৪৬

সশস্ত্র দাঙ্গাবাজরা

হিংসার কলকাতা

অগাস্ট ১৯৪৬

—
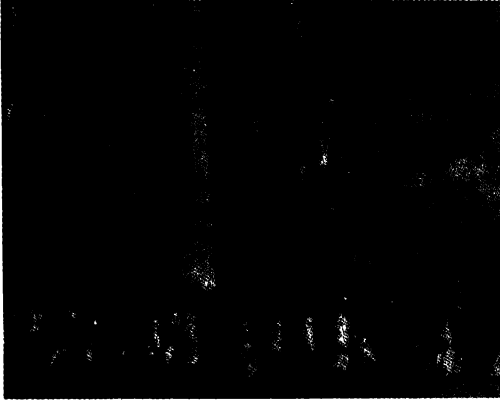
পলায়নরত মানুষজন

—

হিংসার কলকাতা

অগাস্ট ১৯৪৬

এই অপরাধ
তোমার
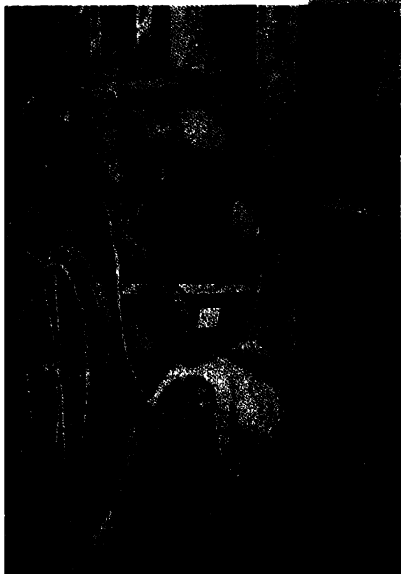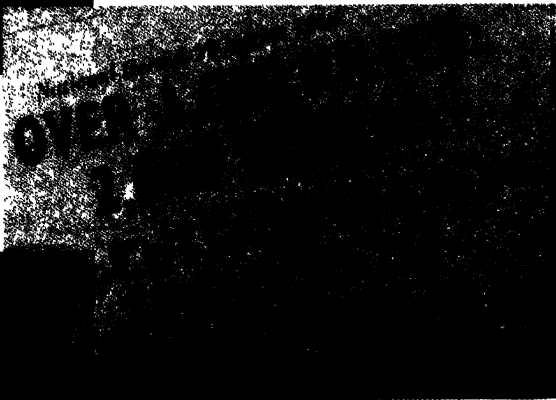
এই অপরাধ
আমার

শ্মশান কলকাতা

হিংসার অবশেষ

মৃত্যু থেকে যারা
ফিরেছিল

কারফিউ-কবলিত
কলকাতা

ভারী-বুটে ভারাক্রান্ত
কলকাতা

অন্ত্যেষ্টিপর্ব
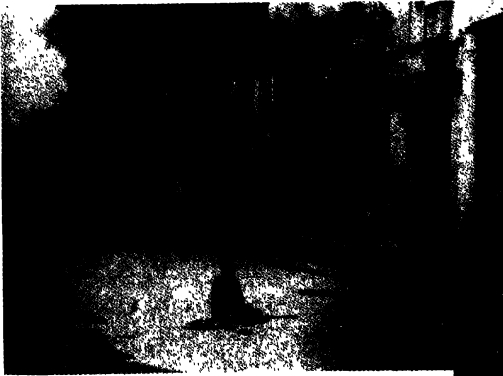
অবশিষ্ট কলকাতা

রাজপথে একলা পাগল

খাদ্যের লাইনে কলকাতা।

শান্তি প্রয়াস
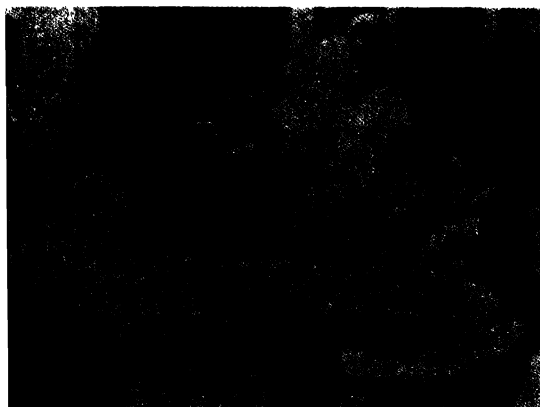
বেলেঘাটায়
গান্ধীর সঙ্গে
সোহরাবর্দি

দাঙ্গার বিরুদ্ধে
কলকাতার রাজপথে
লেখক-শিল্পীদের
অভিযান

ননী (ভূদেব) সেন

স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শচীন্দ্র মিত্র

সুশীল দাশগুপ্ত
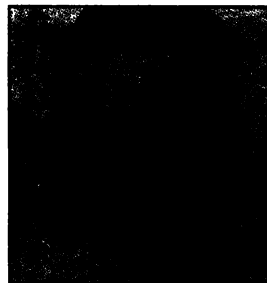
লালমোহন সেন

দাঙ্গা-প্রতিরোধে পাঁচ শহিদ

OAKHALI TROUBLE SPREAD

More Than 5,000 Killed In A Week

KRIPALANI AND BOSE T
VISIT AFFECTED AREA

নোয়াখালিতে গান্ধী

নভেম্বর ১৯৪৬

নোয়াখালিতে দাঙ্গা থামাতে অনশনে বসেছিলেন গান্ধী-অনুগামিনী আমতুস সালাম। ২৫ দিন পরে গান্ধীর হাতেই অনশন ভাঙেন তিনি।

কলকাতায় গান্ধী

অগাস্ট ১৯৪৭

GANDHIJI MAY TAKE TO FASTING: COMMUNAL FRENZY WORRIES HIM

DEPARTURE FOR NOAKHALI DELAYED

More Discussion On Calcutta Riot With Congress Ministers & League Leaders

VISIT TO DISTURBED AREAS TO-DAY

The riot situation in Calcutta is worrying Gandhiji. He has decided to stay on at Sodepur for a day or two more which will delay his departure for Noakhali. He had intended to leave for that place this morning (Monday). He will, however, it is understood, arrive in Noakhali before August 15, on which date he has made it a point to remain in Pakistan.

Gandhiji, it is learnt, will visit some of the riot affected areas to-day.

DISTURBANCES IN CITY

MILITARY FIRING ON MOB

Looting & Arson Cases In Belliaghata & Howrah

Two persons were killed and seven-

The West Bengal Ministers met Gandhiji at 9-30 P.M. on Sunday and had a long discussion lasting for two hours on the communal situation. Besides Dr. P. C. Ghosh, Prime Minister, Messrs. N. N. Das, K. K. Roy, Kumar B. C. Sinha, M. M. Sardar, S. K. Maity, K. P. Mookherjee and H. C. Naskar were present. Mr. A. P. Choudhury, Political Secretary to the Prime Minister, was also present by special invitation.

Mr. Md. Osman, ex-Mayor, Calcutta and some other important members of the Muslim League called on Gandhiji on Sunday morning and it is believed during their one hour stay the riot situa-

অমৃতবাজার পত্রিকা
(১১ অগাস্ট, ১৯৪৭)

একটি আবেদন

কলিকাতায় এবং ঢাকায় এখনও হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর পরস্পরের বুকে ছুরি মারিতেছে, পরস্পর পরস্পরের ঘরে আগুন জ্বালাইতেছে। আজও হিন্দু মহল্লায় মুসলমান নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, মুসলমান মহল্লায় হিন্দু নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। এখনও সরকারী সৈন্য এবং পুলিসের পাহারায় ট্রাম এবং বাস চালাইতে হয়। গ্রামাঞ্চলে এখনও অধিকাংশ স্থানের অবস্থা বাহ্যতঃ শান্ত হইলেও অবিশ্বাস, ভয়, আতঙ্ক, ঘৃণা এবং প্রতিশোধ স্পৃহা হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে এক অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আবার আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, খাদ্যের অভাব এবং অনাহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কৃষকের পাটের দরও অস্বাভাবিক রকমে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি গৃহযুদ্ধ থামাইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার অভাব রহিয়াছে, ইহা যে থামান যায় কিংবা ইহা থামান যে আমাদেরই স্বদেশবাসীর দায়িত্ব সে বিশ্বাসও আজ কদাচিত দেখা যায়।

গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির প্রস্তাব।
(প্রকাশিত পুস্তিকার কিয়দংশ, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)

বিহারে গান্ধী ও সীমান্ত গান্ধী

গান্ধী এবং আব্দুল গফ্‌ফর খান (সীমান্ত গান্ধী)
দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বিহারের একটা বাড়িতে
(মার্চ, ১৯৪৭)

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

স্বাধীনতার ছ-সাত বছর পরে জন্মে স্বাধীনতা দিবস আর সেই অনুষঙ্গে যুদ্ধ-মন্বন্তর আর দাঙ্গার গল্প শুনতে শুনতেই আমরা একরকম বড়ো হয়েছি, বলা যায়। আমাদের শৈশবে কলকাতার প্রবীণেরা দাঙ্গা বলতেন না, রায়টও নয়; তাদের মুখের কথাটা ছিল : 'রায়েট'; আর রায়েট বলতে তাঁরা বুঝতেন ১৯৪৬-কেই। টুকরো টুকরো গল্প অনেক শুনেছি। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল ১৯৪৬ সালে? কেনই বা ঘটল অতবড়ো একটা হত্যাকাণ্ড?

গল্প কোনোদিন এর উত্তর দেয়নি। বিভিন্নজনের স্মৃতিকথায় দেখেছি, প্রসঙ্গটা একবার উল্লেখ করেই 'অকল্পনীয়' 'অবর্ণনীয়'—এরকম কিছু বিশেষণে ভাষার অক্ষমতাটাকেই প্রকাশ করে তাঁরা বিবরণটা শেষ করে দিচ্ছেন। ১৯৮৮ - ৮৯ সালে আমি আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের স্মৃতিকথাগুলো একটার পর একটা পড়ে যাচ্ছিলাম। সেই সময়ই প্রশ্নটা আবার আমাকে আলোড়িত করে। লাইব্রেরিতে খুঁজে কোনো বই পাইনি; কারণ বাঙলা বা ইংরেজিতে ১৯৪৬-র কলকাতা দাঙ্গা নিয়ে তখন কোনো বই ছিল না। কিছু খণ্ডচিত্র পেয়েছিলাম কেবল কয়েকজনের স্মৃতিকথায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আর জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে সাময়িকপত্র আর দৈনিকপত্র থেকে বিবরণ সংগ্রহ করে, পটভূমিটা বোঝার জন্যে সেই সময়ের ইতিহাস একটু পড়ে নিয়ে, স্মৃতিচিত্রের সঙ্গে তাকে জুড়ে আমি প্রথমে একটা প্রবন্ধ লিখি—সেটা ছাপা হয় 'উৎস মানুষ' পত্রিকায়, জানুয়ারি, ১৯৯১। লেখাটা নিয়ে উৎস মানুষ একটি পুস্তিকাও বের করেছিল—১৯৯১ সালের বইমেলায় সেগুলি সবই বিক্রি হয়ে যায়।

যাঁরা কিনেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ আমাকে আরও বিস্তারিতভাবে লেখার জন্য অনুরোধ করেন। কয়েকটা চিঠিও পাই। এই অভাবিত সাড়া পেয়ে আমিও তখন উত্তেজিত বোধ করছিলাম। ফলে ১৯৯১ পুরো বছরটা জুড়ে আমি নিজের মতো করে প্রায় একটা গবেষণা চালিয়ে যাই। প্রচুর তথ্য জড়ো হয়। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবীণজনেদের সঙ্গে আলাপ করে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও কিছু সংগ্রহ করি। এছাড়া কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বই এবং প্রকাশিত নথির সন্ধানও আমি ততদিনে পেয়ে গেছি। উৎস মানুষের বন্ধুরা লেখাটা ধারাবাহিকভাবে ছাপতে রাজি হন। ১৯৯২ সালে আমি বাঙলায় 'উৎস মানুষ' এবং ইংরেজিতে 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় খণ্ড-খণ্ডভাবে লিখতে থাকি।

ইতিমধ্যে আমি জেনেছিলাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক, বর্তমানে উপাচার্য, শ্রীসুরঞ্জন দাস বিশ শতকের বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ নিয়ে গবেষণা করছেন; ১৯৪৬-র কলকাতা নিয়ে তাঁর একটি ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'সোস্যাল সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায়। আমি লেখাটা পড়ে ফেলি; উৎস মানুষে আমার

লেখাটি যখন ধারাবাহিক বেরোচ্ছে, সেই সময়ই হাতে আসে তাঁর গ্রন্থটি : 'কমিউনাল রায়ট্‌স ইন বেঙ্গল'। অধ্যাপক দাস অনেক ব্যাপ্ত একটা সময়কাল (১৯০০-৪৭) ধরে বড়ো মাপের কাজ করেছেন। অত্যন্ত মূল্যবান তাঁর গ্রন্থটি। তিনি অনেক দুর্লভ নথি দেখেছেন। আমি তাঁর বই থেকে দু-একটি তথ্য নোট করে রাখি।

আমি লক্ষ করেছিলাম, অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস ১৯৪৬-এর কলকাতা প্রসঙ্গটা কেবলমাত্র ওই বছরের অগস্ট মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু তারপরও টানা এক বছর ধরে কলকাতায় যে বিক্ষিপ্তভাবে হিংসাকাণ্ড চলেছিল—তার কোনো বিবরণ ওই বইতে নেই। আমি কিন্তু তখন ওই সময়ের অনেক তথ্যই সংগ্রহ করে ফেলেছি। আমি কৃতবিদ্য গবেষক নই। কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বা কোনো প্রবীণ গবেষকের সাহায্য আমি পাইনি। মহাফেজখানায় বসে গোপন নথিপত্র দেখার সুযোগ-ও আমার ছিল না। মূলত পত্রপত্রিকা, স্মৃতিকথা, সাহিত্য, প্রকাশিত কিছু নথিপত্র আর মৌখিক সাক্ষ্যকে অবলম্বন করেই আমি বইটির পরিকল্পনা করেছিলাম। সেইভাবেই আমি লেখাটি লিখতে থাকি এবং অনেকটা অংশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর তা বইয়ের আকার পায় ১৯৯২-র ডিসেম্বর মাসে।

প্রথম সংস্করণে প্রকাশকাল বলা আছে : নভেম্বর, ১৯৯২; কিন্তু বাঁধাইখানা থেকে বইটি হাতে এসেছিল ১৬ ডিসেম্বর। বিলম্বের একটা প্রধান কারণ : ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং তার প্রতিক্রিয়ায় কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হিংসার বিস্ফোরণ, শহরে কারফিউ। মেটিয়াবুরুজ-গার্ডেনরিচ অঞ্চলে আক্রান্ত হয়েছিলেন হিন্দুরা; ট্যাংরা-তপসিয়া অঞ্চলে পুড়েছিল মুসলমানদের বস্তি। সেই সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ত্রাণের কাজ করেছিলাম। ১৬ ডিসেম্বর সেই কাজ সেরে সন্ধ্যায় উৎস মানুষ দপ্তরে পৌঁছে দেখি, বইটি বেরিয়েছে।

এই পটভূমিটার কথা লিখলাম এই কারণে যে, আমার এই বইটির প্রকাশকালের সঙ্গে বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং তার পরবর্তী হিংসাকাণ্ডের ঘটনাটি অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত সেই কারণেই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বইটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচুর বিক্রি হয়েছিল ১৯৯৩ সালের বইমেলায়। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায় মাস ছয়েকের মধ্যেই।

দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর, ১৯৯৩ অবলম্বনেই এবার প্রকাশিত হতে চলেছে নতুন সংস্করণ। এর মাঝখানে প্রায় দু-দশক কেটে গেছে। ইংরেজি এবং বাঙলায় এখন কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। কোনো গ্রন্থে বা প্রবন্ধে আমার বইটির স্বীকৃতি দেখে ভালো লেগেছে; আবার কেউ কেউ স্বীকার না করেও আমার রচনার অংশবিশেষ তাঁদের লেখায় ব্যবহার করেছেন, লক্ষ করেছি। অনেক সহৃদয় পাঠকের চিঠি পেয়েছি। আমার বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের জনাব মির্জা তারেকুল কাদের 'শৈলী' পত্রিকায় (অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৯৭) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তিনি আমাকে সেই পত্রিকাটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল একটি অন্তরঙ্গ পত্র। এর আগে ফ্রন্টিয়ারে প্রকাশিত আমার একটি ইংরেজি রচনাকে অবলম্বন করে গান্ধিজীর নোয়াখালি অভিযান

বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল বাংলাদেশের 'চিন্তা' পত্রিকায়। কলকাতা হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী জনাব মীজানুর রহমান একটি বই প্রকাশ করেন ২০০৫ সালে। কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলের বাসিন্দা ওই প্রবীণ ব্যক্তি তাঁর বইতে একাধিকবার আমার রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। আমার মতো অখ্যাত লেখকের কাছে এগুলোই বড়ো প্রাপ্তি।

আমার বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে যেসব বই বা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, তা থেকে নিশ্চয় আরও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে। আমিও ইতিমধ্যে কিছু তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার আগের কোনো-এক হিংসাকাণ্ডে নিহত হন আচার্য যদুনাথ সরকারের পুত্র। এই তথ্যটি আমার আগে জানা ছিল না। বাগমারি-মানিকতলা অঞ্চলে প্রকাশ কর্মকারের পিতা প্রয়াত শিল্পী প্রহ্লাদ কর্মকারের স্টুডিয়ো এবং তাঁর সব ছবি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই তথ্য আমি পরে জেনেছি প্রকাশ কর্মকারের আত্মজীবনী পড়ে। শ্রীখালেদ চৌধুরীর কাছে শুনেছিলাম, কলকাতার হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো শিল্পী-ই ছবি আঁকেননি। কিন্তু সিমা আর্ট গ্যালারির 'আর্ট অফ বেঙ্গল' প্রদর্শনীতে (২০০১) আমি গোপাল ঘোষের একটি ছবি দেখতে পাই। নোয়াখালিতে গান্ধিজীকে নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন রাধাচরণ বাগচী। গ্যালারি-৮৮তে, ২০০৩ সালের একটি প্রদর্শনীতে সেই ছবি দেখার সুযোগ পাই।

১৯৯৮ সালে কলকাতার কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগার নিয়ে সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারি, মহম্মদ আলি পার্কের বিপরীতে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের ওপর 'সুহৃদ লাইব্রেরি' নামের গ্রন্থাগারটি দাঙ্গার পর কয়েক বছর বন্ধ ছিল; কারণ স্থানীয় বাঙালি হিন্দুরা ওই এলাকা ছেড়ে চলে যান। বাঙলা বইয়ের পাঠক ছিল না। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তালতলা পাবলিক লাইব্রেরিও। অবনীন্দ্রনাথ জসিমুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে একদা মুসলমানি পুঁথি খুঁজতে গিয়েছিলেন মেছুয়াবাজারে। দাঙ্গায় সেই দোকানগুলি সবই ধ্বংস হয়ে যায়।

এরকম কিছু তথ্য পরে প্রকাশিত বইগুলি থেকেও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি আর সেগুলো সংযোজন করতে চাইনি। ১৯৯২ সালে সীমিত সাধ্যে যেটুকু লিখতে পেরেছিলাম, সেই অবয়বটাই সামান্য সংশোধনসহ বজায় রাখতে চেয়েছি নতুন সংস্করণেও। জানি, পাঠক আমার এই অজুহাত ক্ষমা করবেন না; তবু বলছি, গুজরাত গণহত্যার (২০০২) পর আমার আর দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিয়ে কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না। বড়ো ক্লান্ত, বিষণ্ণ লাগে। যে-কথা দিয়ে ১৯৯২ সালে আমার বই শেষ করেছিলাম, সেই অংশটুকু আর-একবার পড়ে নিলে পাঠক হয়তো আমার এই মানসিক অবস্থাকে কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

বইটিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যেটুকু প্রয়াস আছে, আমার সেই দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। সে কারণেও বইটির বিন্যাস আর বদলানোর প্রয়োজন দেখি না। বানানরীতিও মোটামুটি অপরিবর্তিত রইল। সংযোজন করা হয়েছে কেবল কয়েকটি ছবি এবং নথিপত্রের প্রতিলিপি। সেগুলি সংগ্রহের কৃতিত্ব প্রকাশকের; দায়িত্বও তাঁর।

*　　　　*　　　　*

বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশ লেখকের কাছে সব সময়ই আনন্দদায়ক। এ-ক্ষেত্রে আমার আনন্দকে বিষাদমলিন করে দিচ্ছে উৎস মানুষের কর্ণধার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু। অশোকের সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল; বইটার ব্যাপারেও তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। নতুন সংস্করণ অশোক দেখে যেতে পারল না—এই দুঃখ আমার থেকেই যাবে। মনে পড়ছে আর-এক অকালপ্রয়াত বন্ধু অমিতাভ চন্দ্রর কথা-ও। অমিতাভ বইটা পড়ে খুব উত্তেজিত হয়ে জনেজনে প্রচার করেছিল; নিজে একটি দীর্ঘ আলোচনা লিখেছিল 'অনীক' পত্রিকায়। নতুন সংস্করণটি আমি অশোক আর অমিতাভর স্মৃতিতে উৎসর্গ করলাম। ২০০৯ শহিদ শচীন্দ্র মিত্র-র জন্ম শতবর্ষ। তাঁর কথা এই বইতে আছে। শহিদ শচীন্দ্র মিত্রকে এই প্রসঙ্গে আর-একবার স্মরণ করি।

উৎস মানুষের বন্ধুরা ঝুঁকি নিয়ে বইটি ছেপেছিলেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই বন্ধু ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। ভাস্করের সযত্ন প্রয়াসেই একটি মাঝারি মানের প্রেস থেকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন আকারে বইটি প্রকাশিত হতে পেরেছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের দায়িত্ব নিয়েছিল তরুণ বসু, তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু এখনো কেউ কেউ আমার কাছে বইটি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে চান; তা থেকে বুঝতে পারি, অনেকদিন আগে লেখা হলেও বইটির চাহিদা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। উৎস মানুষের পক্ষে আর নতুন করে ছাপা সম্ভব ছিল না। এ-অবস্থায় র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশনের অরুণকুমার দে উদ্যোগ না নিলে বইটি হয়তো হারিয়েই যেত। র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশনকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ সেই চেনা-অচেনা লেখক-পাঠকদেরও, যাঁরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বইটির কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

প্রস্তাবনা

দাঙ্গা থেকে দেশভাগ : ফিরে দেখা

অখণ্ড বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। গত শতাব্দীর শেষ থেকে স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ দশক সময় জুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসায় বারবারই লাঞ্ছিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত বাসভূমি। প্রতিটি দাঙ্গার পিছনেই নির্দিষ্ট কিছু কারণ ছিল; দাঙ্গাগুলি চরিত্রের দিক থেকেও একই ধরনের ছিল না।

উনিশশো পাঁচের বঙ্গভঙ্গ বাঙালি হিন্দুর প্রাণে যতটা দাগা দিয়েছিল, বাঙালি মুসলমানের বোধে তা তেমন করে বাজে নি। হিন্দু জমিদারদের কাছে বাঙলা ভাগের পরিণাম ছিল পূর্ববঙ্গে তাদের আধিপত্য চলে যাওয়া; অন্যদিকে মুসলমান মধ্যবিত্তের কাছে বঙ্গভঙ্গ মানে পূর্ববঙ্গে মুসলমান-প্রধান একটি প্রদেশের প্রতিষ্ঠা। অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রভেদই হিন্দু-মুসলমানকে এক হতে দেয় নি স্বদেশী পতাকার নিচে। আন্দোলন যখন তুঙ্গে, বাঙলার মাটি বাঙলার জল এক হওয়ার প্রার্থনা উচ্চারিত হচ্ছে স্বদেশী গানে, সেই পর্বেই ময়মনসিংহে এবং আরও দু-একটি জায়গায় ঘটে গেছে কয়েকটি দাঙ্গার ঘটনা। মুসলমান চাষিও যোগ দিয়েছে সে দাঙ্গায়; দাঙ্গা তার কাছে হিন্দু জমিদারদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটা প্রকাশ।

বিশের দশকের গোড়ায় অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের সুবাদে হিন্দু-মুসলমানের যে সাময়িক মিলন, ভিত তার শক্ত ছিল না; আর তাই আন্দোলনের অকাল পরিসমাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যেই মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে বিরোধ আর তা থেকে শোচনীয় দাঙ্গা ঘটে যায় কলকাতায় এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে।

বাঙলায় হিন্দু জমিদার বনাম মুসলমান চাষি—ভূমি-সম্পর্কের এই দ্বন্দ্বই নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের একটা বড় কারণ; তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বিশের দশকের আগেই এই সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছিল; বৈষম্য আরও বেশি ছিল শিক্ষায় ও চাকরির সুযোগ-সুবিধায়, মধ্যবিত্ত স্বার্থে।[১] তুলনায় অনগ্রসর মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে ততদিনে উঠে এসেছে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী; প্রখর হয়েছে তার আত্মমর্যাদার আর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা; দাঙ্গার রাজনীতিতেও এসে যাচ্ছে তার প্রতিফলন।

১। Partha Chatterjee, '*Agrarian Relations and Communalism in Bengal* (1926 - 35)' in Subaltern Studies – 1, ed. by Ranajit Guha

মুসলমান মধ্যবিত্তের এই দাবিকে মর্যাদা দিয়ে বাঙলার প্রাদেশিক আইন পরিষদে তাদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দিতে চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ; বাধা দিয়েছিল হিন্দু কায়েমী-স্বার্থ। ১৯২৫-এ চিত্তরঞ্জনের অকাল প্রয়াণের পর সমাধি দেওয়া হল সেই চুক্তির সম্ভাবনাকে। কংগ্রেস-লীগের সম্পর্ক এরপর প্রায় ভেঙে পড়ল ১৯২৮-এর শেষে, মতিলাল নেহরু রিপোর্ট নিয়ে বিতর্কের সময়, যখন হিন্দু মহাসভার এবং কায়েমী হিন্দু স্বার্থের চাপে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব এবং বাঙলা-পাঞ্জাবে তাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের দাবি নাকচ করে দিল কংগ্রেস। জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, এই চুকে গেল কংগ্রেস-লীগের সম্পর্ক।[১] ওই দাবিগুলি মেনে নিলে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন জিন্নাহ; কিন্তু কায়েমী হিন্দু স্বার্থ তা মেনে নেয়নি। কংগ্রেস-লীগ সমঝোতা ভেঙে পড়ে এর ফলে। ১৯২৯-এর মার্চে লীগ পেশ করে তার '১৪ দফা' দাবি; সে দাবিও কংগ্রেস স্বীকার করেনি। এরপর লীগ ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি আদায় করে নিতে সক্ষম হয়; সাম্প্রদায়িক বিভাজন একরকম আইনসিদ্ধ হয়ে যায় এর ফলে।

বাঙলা-পাঞ্জাবে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে তাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের দাবি অমূলক মনে করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু মুসলিম লীগের কাছে এটা ছিল খুবই জরুরি; আইনগত সংরক্ষণের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ওই দুই প্রদেশে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তারা। স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে নির্বাচনের পর ১৯৩৭-এ বাঙলার আইন পরিষদে কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনে ক্ষমতায় এসে সেই লক্ষ্য অর্জনের পথেই সক্রিয় হয় লীগ। ১৯৪৩-এ এককভাবে বাঙলার প্রাদেশিক সরকার গঠন করার পর আরও ব্যাপকতা পায় সেই প্রয়াস। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য ছিল; মুসলমানদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের বাসনা আরও তীব্র হয় এর ফলে। গ্রামে গিয়েও লীগের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন মুসলমান তরুণ। শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাসে সুন্দর ধরা আছে এই প্রক্রিয়াটা।

ইতিমধ্যে ১৯৪০-এর মার্চে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পাকিস্তান-ই মুসলমানের উন্নতির একমাত্র পথ—লীগ নেতারা এইভাবে প্রচার করতে শুরু করেন গ্রামে-গঞ্জে। বলা হয় : পাকিস্তান মানে হিন্দু জমিদারের নিপীড়ন থেকে মুসলমান চাষির মুক্তি। প্রজাস্বত্ব এবং কৃষক ঋণ-সংক্রান্ত কয়েকটি জনমুখী আইনেরও প্রবর্তন করা হয় এই সময়। গ্রামের সাধারণ মুসলমান চাষিও অনুভব করতে থাকেন, পাকিস্তান ছাড়া তার মুক্তি নেই। তিরিশের দশকের শেষে ফজলুল হক গ্রামে গিয়ে দুবেলা 'ডাল-ভাত', জমিদারী উচ্ছেদ আর বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতেন। চল্লিশের দশকে লীগ এককভাবে সরকারে আসার পর পাকিস্তান-ই চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করা হয়। মুসলমান যুব সমাজ লীগে যোগ দেন একটা আদর্শের প্রেরণা থেকে; 'পাকিস্তান' তাঁদের কাছে হয়ে ওঠে হিন্দু নিপীড়ন থেকে মুক্তির আর মুসলিম স্বাতন্ত্র্যচেতনার

১। David Page, *Prelude to Partition*, p 175, Sumit Sarkar, *Modern India*, pp 262-63

প্রতীক। ১৯৪৬-এর মার্চ নির্বাচনে শুধুমাত্র 'পাকিস্তান' স্লোগান দিয়েই ১১৯টা মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৪টা পেয়ে যায় লীগ। স্বাধীন রাষ্ট্রের চেতনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ততদিনে আরও প্রখর হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে;[১] ধুতি ছেড়ে তাঁরা এখন কুর্তা-পাজামা ধরেছেন।[২]

অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধছে হিন্দু সমাজের মধ্যেও। মুসলিম লীগ ক্ষমতায় আসার পর মুসলমান আধিপত্যের আতঙ্ক ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠেছে হিন্দুদের মধ্যে। ১৯৪০-এর আদমসুমারির সময় লীগের প্রচার অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে উৎসাহ দিয়েছিল।[৩] হিন্দু মহাসভা পাল্টা আওয়াজ তোলে : মুসলমানরা বাঙলাকে গ্রাস করে ফেলছে, মুসলমান শাসনে বাঙলার শিক্ষা সংস্কৃতির ইসলামীকরণ করা হচ্ছে, বাঙলার কৃষ্টি নষ্ট হতে বসেছে। 'বঙ্গীয় মধ্য শিক্ষা বিল' নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ এক অস্বাভাবিক রূপ নেয় ওই বছরই। হিন্দুদের দাবি, তাঁদের উদ্যোগেই বাঙলায় শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে; সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির দাবি তাঁরা মানবেন না। অন্যদিকে মুসলমানদের অভিযোগ, হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকারের ফলে হিন্দু প্রভাবিত হয়ে পড়েছে বাঙলার শিক্ষা।[৪] দুই সম্প্রদায়ের নেতারাই এই সময় গ্রামে গিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাতে শুরু করেন ১৯৪১-এ একটা দাঙ্গাও হয়ে যায় ঢাকায়।

তিরিশের দশকের শেষ থেকেই হিন্দুত্বকে একটা জঙ্গি রূপ দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৯-এ হিন্দু মহাসভা দাবি তুলেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সামরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। ১৯৪২-এ কানপুর অধিবেশনে মহাসভা নেতা সাভারকর ধ্বনি তোলেন : Hinduise all Politics and Militarise Hindudom। পরের বছর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দাবি করেন, একটা শক্তিশালী এবং বলশালী হিন্দু আন্দোলনকে (A strong and virile Hindu movement) ভারতীয় রাজনীতিতে নিয়ে আসতে হবে; নিষ্ঠাবান হিন্দু সেবকবাহিনী গড়ে তোলার ওপরও তিনি জোর দেন।[৫] চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ায় সারা ভারতে ৭৬,০০০। পাকিস্তান দাবির আন্দোলন যেমন প্রবল হয়ে ওঠে, তেমনি তার পাশাপাশি চলতে থাকে জঙ্গি হিন্দু আন্দোলনের প্রক্রিয়াও। সাম্প্রদায়িক ভেদরেখায় বিদীর্ণ হয়ে যায় বাঙলার জনসমাজ।

১। Middle class Muslims had become aware of their political rights during teh years of the Muslim League and were determined not to allow ther Hindus to capture power again ' (Ikramulhah, *Suhrawardy* ' P 45)

২। অন্নদাশঙ্কর রায়, 'স্বাধীনতার পূর্বাভাস', পৃ ১২

৩। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, 'উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব', পৃ ২০৮

৪। 'প্রবাসী' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩) পত্রিকায় লেখা হয়, লীগ 'বাঙালী হিন্দু ধ্বংস সাধনের' আয়োজন করছে। মধ্য শিক্ষা বিল নিয়ে বিতর্কের বিশদ আলোচনা করেছেন পরমেশ আচার্য, 'অনুষ্টুপ', শারদীয় ১৯৮৮

৫। VD Savarkar, *Hindu Rastra Darshan*, pp 113,229, Shyamaprasad Mukherjee, *Awake Hindusthan*, pp 83 - 84, 86 - 87

দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থের এই অন্তর্গত প্রভেদই আরও তীব্র হয়ে ওঠে ১৯৪৬-এর মে মাসে 'ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব' প্রকাশিত হওয়ার পর। তলে তলে জমে ওঠা হিংসা-দ্বেষ একটা বিরাট বিস্ফোরণ হয়ে ফেটে পড়ে ছেচল্লিশের ১৬ অগাস্ট, কলকাতায় তারপর শুরু হয় প্রমত্ত হিংসার, অমানুষিক নৃশংসতার এক ধারাবাহিক অভিযান—কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার-গড়মুক্তেশ্বর-পাঞ্জাবে: '*বিকলাঙ্গ লাশ কাঁধে লোক চলে গোরস্থানে কিম্বা পোড়াবার ঘাটে*।'*

১৯৪৫-এর ২১ নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস, ১৯৪৬-এর ১১ - ১৩ ফেব্রুয়ারি রসীদ আলী দিবস এবং তারও পরে ২৯ জুলাইয়ের সাধারণ ধর্মঘটের দিনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মিছিলের দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন, ১৬ অগাস্টের কলকাতা স্বভাবতই তাঁদের বিমূঢ় করে দেয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, ওইসব বীরত্বময় আন্দোলনের পাশাপাশি গড়ে উঠছিল আর এক ধরনের প্রস্তুতিও, যার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল ১৯৪৬-এর মার্চ নির্বাচনে; বোঝা যাচ্ছিল, ক্ষমতা হাতে আসতে আর বেশি দেরি নেই; এই পরিস্থিতিতে কে কতটা ক্ষমতা দখল করতে পারবে, বাঙলা ভাগ হলে কলকাতা কার ভাগে থাকবে—এইসব হিসেবনিকেশের ব্যাপারটাও জরুরি হয়ে উঠেছিল প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের কাছে; কলকাতা দাঙ্গাকে দেখতে হবে এই প্রেক্ষিতের সঙ্গে মিলিয়ে।

ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের বাঙলার দাঙ্গাচিত্রই আমাদের আলোচনার বিষয়। দাঙ্গা এই পর্বে বাঙলার রাজনীতির সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল, দাঙ্গাকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই নির্বিবেক রাজনীতির প্রক্রিয়াটাই বুঝতে চেয়েছি আমরা। এই পর্বটির ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই, কারণ এই দাঙ্গাচক্রের বিয়োগান্ত পরিণাম যে দেশভাগ, তার দায় আজও বহন করতে হচ্ছে দারিদ্র্য-পীড়িত এই উপমহাদেশকে, বিশেষত বাঙলাকে।

বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক যে আজও স্বাভাবিক হতে পারল না, তার একটি প্রধান কারণও এই পর্বের দাঙ্গা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই দাঙ্গার রূপ যাঁরা দেখেছেন, ভুলতে পারেন না তাঁরা সেই বিভীষিকার কথা; পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস, প্রবঞ্চনার বোধ, হিংসার উগ্র প্রকাশ—সহজে মুছে যাবার নয় সেই সব স্মৃতি। সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় আজও আকীর্ণ তাই এই ইতিহাস। প্রচুর তথ্য আছে, আর তার পাশাপাশি আছে অজস্র অর্ধসত্য আর মিথ্যা প্রচার। সেই প্রচারের ধারায় প্লাবিত না হয়ে, ইতিহাসের সেই রক্তমাখা পাতাগুলো নিজে হাতে উল্টে দেখে ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের দাঙ্গাচক্রের একটি বিবরণ রচনার প্রয়াস এখানে পাওয়া যাবে। বলে নেওয়া ভালো, এ-রচনা দেশ-ভাগের রাজনীতির, কংগ্রেস-লীগ আন্তঃসম্পর্কের বা সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতির কোন সামগ্রিক ইতিহাস নয়; ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের বাঙলায় দাঙ্গা কিভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল এবং সাধারণ মানুষের ওপর তার প্রভাব কেমন ছিল—প্রধানত এই বিষয়টাই বুঝতে চেয়েছি আমরা এই রচনায়।

* সমর সেনের কবিতা

ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গা : পটভূমি

ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বুঝতে পারে, তাদেরও এবার ভারত থেকে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে।

সাম্রাজ্যবাদের নিজের ভেতরকার সংকট ছিল; অন্য দিকে দেশও উত্তাল হয়ে উঠেছিল গণবিক্ষোভে। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন গণ-জাগরণের রূপ নিয়েছিল রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছিল শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা; উনিশশো ছেচল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে নৌ-বিদ্রোহ, পঁয়তাল্লিশের নভেম্বরে আর ছেচল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় যুব-উত্থান—একের পর এক ঘটনায় উদ্বিগ্ন হবার মতো কারণ ছিল সাম্রাজ্যবাদের।

১৯৪৬-এর মার্চে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিন মন্ত্রীর এক প্রতিনিধিদলকে তাই ভারতে পাঠানো হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি এবং সংবিধান রচনার নীতি নির্ধারণের জন্য। ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা আর বাদ-বিসংবাদের পর ওই প্রতিনিধি দল বা 'ক্যাবিনেট মিশন' ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে একটি রূপরেখা পেশ করলেন ১৬মে। প্রতিনিধিরা ছিলেন স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, পেথিক লরেন্স এবং এ.ভি আলেকজান্ডার।

মিশনের এই প্রস্তাবে একটি ত্রি-স্তর সংযুক্ত কাঠামোর কথা বলা হয়েছিল। এই কাঠামোয় কেন্দ্রের ক্ষমতা তুলনায় কম; তার অধীনে থাকবে কেবল বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা আর যোগাযোগ বিভাগ।

প্রদেশগুলি সম্পর্কে বলা হয় : ১৯৩৫-এর আইন অনুসারে প্রদেশগুলিতে ইতিমধ্যেই যে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠন করা হয়েছে, সেগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে গ্রুপ 'এ'; পাঞ্জাবসহ উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলি নিয়ে গ্রুপ 'বি'; আর বাঙলাসহ উত্তর-পূর্বের মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলি নিয়ে গ্রুপ 'সি'। গ্রুপগুলির নিজেদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে; কোন্ কোন্ বিষয় যৌথ দায়িত্বে রাখা যায়, তা নির্ধারণের অধিকারও তাদের দেওয়া হবে। এই তিন গ্রুপের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে কেন্দ্রীয় সংবিধান সভা।

নতুন সংবিধান রচনার পর কোন একটি প্রদেশ ইচ্ছে করলে যে গ্রুপে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। নতুন সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর প্রাদেশিক বিধানসভা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

নতুন সংবিধান রচনার অধিকার থাকবে কেন্দ্রীয় সংবিধান সভা বা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লির ওপর। সমতার ('প্যারিটি') ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সভা গঠন করা হবে এবং কোন্ সম্প্রদায় কটি আসন পাবে, তা ঠিক হবে ওই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাতে। সংবিধান সভায় বসার সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এ-বি-সি এই তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবেন। গ্রুপ সংবিধান এবং গ্রুপের অধীনে কোন্ কোন্ বিষয় থাকবে, তা স্থির হয়ে যাবার পর তিনটি গ্রুপ এক সঙ্গে বসে কেন্দ্রীয় সংবিধান রচনা করবে। ইতিমধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও গঠন করা হবে। মিশন পরিকল্পনা অনুসারে সংবিধান রচনার পর একটি স্থায়ী সরকার গঠন করে, তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

মূল সূত্রগুলি এই রকম :[১]

> There should be a Union of India embracing both British India and the States which should deal with the following subjects : foreign affairs, defence and communications ... All subjects other than the union subjects and all residuary powers should vest in the provinces.
>
> Provinces should be free to form Groups with executives and legislatures and each Group could determine the provincial subjects to be taken in common.
>
> As soon as the new constitutional arrangements have come into operation, it shall be open to any province to elect to come out of any group in which it has been placed. Such a decision shall be taken by the Legislatures of the province after the first general election under the new constitution.

ওজরআপত্তি : কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ

১৬ মে-র এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রথম আপত্তি তোলে বাধ্যতামূলক গ্রুপভাগের প্রশ্নে। গান্ধীর পরিষ্কার বক্তব্য ছিল, কোন প্রদেশকেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন গ্রুপে যোগ দিতে বাধ্য করা চলবে না। ২৪ মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে এই বক্তব্যটিকেই প্রতিষ্ঠা করা হয় এইভাবে যে, প্রদেশগুলি কে কোন্ গ্রুপে যাবে, তা ঠিক করার অধিকার তাদেরই দিতে হবে : provinces shall make their choice whether or not to belong to the section in which they are placed . আরও বলা হয়, সংবিধান রচনার এবং তাকে কার্যকরী করার পূর্ণ অধিকার ('final authority') দিতে

১। N Mansergh ed *The Transfer of Power*, *Vol. VIII*, pp 501-2,
V P. Menon, *The Transfer of Power in India*, pp 267-69

হবে সংবিধান সভাকে। এ ছাড়া গ্রূপকে তার অধীনস্থ প্রদেশগুলির সংবিধান রচনার দায়িত্ব দিয়ে প্রদেশের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে কংগ্রেস অভিযোগ করে এবং তার এমন আশঙ্কাও থাকে যে, এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে কোন একটি গ্রূপ তার অধীনস্থ কোন একটি প্রদেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে পারে।[১] এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতে ২৫ মে বড়লাট ওয়াভেলকে লেখা একটি চিঠিতে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ জানিয়ে দেন, মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।[২]

সংবিধান সভায় প্রতিনিধিত্বের ছকটি বড়লাটের প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছিল এরকম : কংগ্রেসের জন্যে ৫টি, লীগের জন্যে ৫টি এবং অন্যান্যদের জন্যে ২টি আসন। এর বিরোধিতা করে কংগ্রেস দাবি করে : কংগ্রেস (শুধু হিন্দুদের জন্য)—৫; লীগ—৪ কংগ্রেস মহিলা—১; তফশিলভুক্ত কংগ্রেস—১; স্বতন্ত্র মুসলমান—১; অন্যান্য সম্প্রদায়—৩।[৩] এ ছাড়া কংগ্রেস আরও দাবি করে, স্বতন্ত্র মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারও কংগ্রেসকে দিতে হবে। এইভাবে কংগ্রেস কার্যত ৮ জন প্রতিনিধি চায়।

মিশন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রধান আপত্তি ছিল, এই প্রস্তাবে পাকিস্তান দাবি স্বীকার করা হয়নি এবং মিশন মুসলমানদের প্রতি চরম ঔদাসীন্য দেখিয়েছে। একটি অবিভক্ত সংবিধান সভার প্রস্তাবও লীগ পছন্দ করেনি।[৪]

প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে লীগের দাবি ছিল : কংগ্রেস (শুধু হিন্দু)—৫; লীগ—৫ তফশিলভুক্ত জাতি— ১; শিখ—১; —এইভাবে প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে।[৫]

সমঝোতার শর্ত : লীগ এবং কংগ্রেস

কিন্তু এত সব আপত্তি সত্ত্বেও ৬ জুন লীগ মিশন প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হয়; কারণ লীগের মনে হয়েছিল, মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রূপ গঠনের যে ব্যবস্থা, তার ভেতরেই নিহিত আছে পাকিস্তানের বীজ : The basis and foundation of Pakistan are inherent in the Mission's Plan by virtue of compulsory grouping of the six Muslim provinces. লীগের আশা ছিল, ওই দুটি গ্রূপ নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে : it would ultimately result in the establishment of complete and sovereign Pakistan। এটা লীগ ভালোভাবেই মনে রেখেছিল, আর তাই যে সভায় মিশন প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত

১। Mansergh, *op cit*, pp 502-3, Anita Inder Singh, *The Origins of the Partition of India*, pp 166-67

২। Mansergh *op cit*, p 502

৩। Singh, *op cit*, p 171, Menon, *op cit*, pp 277-78

৪। Saida, *A Nation Betrayed*, October 1946, pp 192-93, Singh, *op cit*, p 167

৫। Sumit Sarkar, *Modern India*, pp 430-31

নেওয়া হয় সেই সভাতেই জিন্নাহ্ জানিয়ে দেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ভারতের মুসলমানরা শান্ত হবে না : Muslim India will not rest content until we have established full, complete and sovereign Pakistan.[১]

প্রতিনিধিত্বের অনুপাত নিয়ে লীগের আপত্তি অবশ্য রয়েই যায়। তবে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিলে লীগকে তার প্রাপ্য অংশ দেওয়া হবে, বড়লাটের এই প্রতিশ্রুতি লীগকে কিছুটা আশ্বস্ত করেছিল। লিখিতভাবে না হলেও মুখে অন্তত ওয়াভেল বলেছিলেন : We do not propose to make any discrimination in the treatment of either party. লীগের প্রতি কোনভাবেই বৈষম্য করা হবে না, এমন আশ্বাসও ওয়াভেল দিয়েছিলেন এবং জিন্নাহ্ তাতে মোটামুটি সন্তুষ্ট ছিলেন। কংগ্রেস মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে লীগকেই সরকার গঠন করতে ডাকা হবে, এমন আশাও জিন্নাহর ছিল, এবং ওয়াভেল সেই রকম প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।[২]

কিন্তু সমস্যার জট এত সহজে খোলার মতো ছিল না। কংগ্রেস কিছুতেই বাধ্যতামূলক গ্রুপ ভাগ এবং কংগ্রেস লীগের সমান প্রতিনিধিত্ব মেনে নিতে রাজি ছিল না। ওয়াভেল বুঝিয়েছিলেন, গ্রুপ ভাগ ব্যাপারটা ঠিক বাধ্যতামূলক নয়; আলাদাভাবে বসতে হবে এটাই শর্তাধীন; আর অন্তর্বর্তী সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা না হলেও 'বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির একটা আস্বাদ' (a sense of freedom from external control) ভারতকে অবশ্যই দেবে।[৩] কিন্তু কংগ্রেস এতে তুষ্ট হয় না। প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বড়লাটের প্রস্তাব ছিল : কংগ্রেস ৬, লীগ ৫ এবং অন্যান্যদের জন্যে ২টি আসন; কিন্তু এ প্রস্তাবও কংগ্রেসের পছন্দ হয় না।[৪]

এই চূড়ান্ত অচলাবস্থার মাঝখানে ১৬ জুন মিশন ৬ : ৫ : ৩ (কংগ্রেস : লীগ : অন্যান্য) ফর্মুলা পেশ করে ঘোষণা করে, ১৬ মে-র প্রস্তাব যে মানবে, তাকে নিয়েই অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে।[৫]

জিন্নাহ্ স্বভাবতই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, সমান প্রতিনিধিত্বের প্রতিশ্রুতি থেকে মিশন সরে যাচ্ছে। তাঁকে বলা হয়, মিশন সমান প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি; এ অবস্থায় জিন্নাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নিতে পারেন : he was released from this promise when the basis was changed.[৬]

১। Saida, *op cit*, pp 184-85, 192-94,
Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman*, pp 191-93

২। Singh, *op cit*, p 168; Jalal *op cit*, p 201

৩। Mansergh, *op cit*, pp 502-3; Menon, *op cit*, pp 275-76;
A.G. Noorani in *The Partition of India* ed by C H Philips et al, pp 107-8

৪। Menon, *op cit*, p 278

৫। *Ibid*, pp 278-79; Singh, *op cit*, p 171

৬। Singh, *op cit*, p 171

এই কথার পরই মিশনের সঙ্গে লীগের চুক্তি ভেঙে যেতে পারত; কিন্তু ওয়াভেল আবার মাঝখানে এসে জিন্নাহকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন এই বলে যে, মিশনের ওই ছক চূড়ান্ত নয় এবং কংগ্রেস-লীগ দুজনের সম্মতি না নিয়ে মিশন পরিকল্পনার নীতিতে কোন পরিবর্তন করা হবে না : no change in principle will be made in the statement without the consent of two major parties.[১]

ইতিমধ্যে ১৬ জুন মিশনের চরম প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ২৪ জুন মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সম্মত হয়। আর টালবাহানা করলে হয়ত মিশন লীগকে দিয়েই সরকার গঠন করাতে পারে—এ রকম আশঙ্কা সম্ভবত কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করেছিল। কংগ্রেসের এই সম্মতিদানের পিছনে আর একটি চতুর চালও ছিল। কংগ্রেস পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে, কিন্তু বাধ্যতামূলক গ্রুপ ভাগের বিরুদ্ধে তার আপত্তি বজায় রাখে : they adhered to their own interpretations of the statement such as that relating to the grouping of provinces. বলা হয়, স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার স্বার্থেই সংবিধান সভায় যোগ দিতে রাজি হয়েছে কংগ্রেস।[২]

সঙ্গত কারণেই লীগের মনে হয়েছিল, কংগ্রেসের এই শর্তসাপেক্ষ সম্মতি আসলে সম্মতিই নয়। অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নেয়, যখন ১০ জুলাই বম্বেতে এক সাংবাদিক সভায় নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি নেহরু ঘোষণা করেন, কংগ্রেস কেবলমাত্র সংবিধান সভায় যোগ দিতেই রাজি হয়েছে; এবং মিশনের দেওয়া ছক সে প্রয়োজনে অদল-বদল করে নিতে পারে : The Congress had agreed only to participate in the Constituent Assembly and had regarded itself free to change or modify the Cabinet Mission Plan as it thought best.[৩]

তিন সপ্তাহ পরে ২৯ জুলাই লীগ যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়, তার পিছনে নেহরুর এই আপত্তিকর উক্তি নিঃসন্দেহে প্ররোচনা জুগিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত পরিণতিটা হয় মারাত্মক। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ('ডিরেক্ট অ্যাকশন') কেবল একটা স্লোগানই ছিল না। ১৬ অগাস্ট কলকাতায় ওই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামেই শুরু হয় বীভৎস ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। এক অকল্পনীয় হিংসার তাণ্ডব চলে পুরো চারদিন ধরে। অক্টোবরে ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই শুরু হয় নোয়াখালিতে হিন্দুদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন; পাল্টা হিসাবে ব্যাপক মুসলমান নিধন হয় বিহারে। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে উত্তরপ্রদেশ আর পাঞ্জাবেও। ১৯৪৬-৪৭-এর যে টানা দাঙ্গা, যার সঙ্গে দেশভাগ তথা খণ্ডিত স্বাধীনতার একটা প্রত্যক্ষ যোগ আছে, তার সূচনা হয় নিঃসন্দেহে ১৬ অগাস্ট থেকেই।

মৌলনা আজাদ, নেহরুর ওই দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমালোচনা করেছেন; নেহরুকে কংগ্রেস সভাপতি মনোনয়ন করাটা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের

১। *Ibid*, p 172, Menon, *op cit*, p 279

২। Menon, *op cit*, p 281

৩। Abdul Kalam Azad, *India Wins Freedom* (Complete Edition, 1988), pp 164-65

সবচেয়ে বড় ভুল—'perhaps the greatest blunder of my political life'—এমন মন্তব্যও আজাদ করেছেন; আজাদ আরও লিখেছেন, তিনি চেয়েছিলেন, কংগ্রেস একটা বিবৃতি দিয়ে জানাক, নেহরু যা বলেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত মত। কিন্তু নেহরু রাজি হন না; কারণ তাহলে তাঁর ইজ্জত চলে যাবে। কংগ্রেস তাই নেহরুর উক্তির উল্লেখ না করেই বিবৃতি দেয়; সেখানে বরং লীগকেই তার মত পালটানোর জন্যে সমালোচনা করা হয়।[১]

আজাদ নেহরুকেই কেবল দায়ী করেছেন; বলেননি যে, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা নিয়ে কংগ্রেসের যে টালবাহানা, তার সঙ্গে তিনি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাঁর মনোভাব কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের থেকে আলাদা কিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস মিশন প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পর লীগের প্রতি মিশনের মনোভাবও বদলে যায়। মিশন তার শর্ত অনুযায়ী চলার জন্যে লীগকে রীতিমতো চাপ দিতে থাকে। ২৪ জুন কংগ্রেস মিশন প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরই লীগকে জানিয়ে দেওয়া হয়, কংগ্রেস যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে রাজি হয়নি, সে বিষয়ে মিশন পরে সিদ্ধান্ত নেবে; এছাড়া কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মুসলমান প্রতিনিধি মনোনয়নের দাবির বিরুদ্ধে লীগের যে আপত্তি, তা মেনে নেওয়া মিশনের পক্ষে সম্ভব নয়।[২]

কংগ্রেসের কাছে তার সেকুলার ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্যে এই দাবিটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু লীগের কাছে এটা ছিল একটা বড় আঘাত; কারণ এটা মেনে নিলে মুসলিম লীগ-ই যে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি, এই দাবি টেকে না। অন্যদিকে মিশনের ৬ : ৫ : ৩ ফর্মুলাও লীগকে ক্ষুব্ধ করেছিল। মুখে অন্তত ওয়াভেল সমান প্রতিনিধিত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জিন্নাহও লীগ কাউন্সিলকে সেইমতো আশ্বাস দিয়ে রেখেছিলেন।[৩] মিশনের ফর্মুলা সে আশাও ভেঙে দেয়। লীগ আগে মিশন প্রস্তাব মেনে নেওয়া সত্ত্বেও যে তাকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়নি[৪]—এই ঘটনাতেও লীগের দিক থেকে নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করার কারণ ছিল; আর এই পরিস্থিতিতেই আসে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক।

চূড়ান্ত একটা আঘাত এনে তার ক্ষমতার বহরটা একবার দেখিয়ে দিতে চায় লীগ।

১। *Ibid*, pp 162-66

২। Singh, *op cit*, p 173, Jalal, *op cit*, p 206

৩। Singh, *op cit*, p 170; Jalal, *op cit*, pp 201-2

৪। Singh, *op cit*, p 170; Menon, *op cit*, pp 281-82

'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'

প্রস্তুতিপর্ব

২৯ জুলাই ১৯৪৬।

ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে এক ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হচ্ছে সেদিন বাঙলায়; হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য সব সম্প্রদায়ের লক্ষাধিক মানুষ যোগ দিয়েছেন সে ধর্মঘটে। ৩১ জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদ-শিরোনাম : General Strike by All Communities; লেখা হয়েছে, দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে 'বৃহত্তম সাধারণ ধর্মঘট' পালিত হয়েছে কলকাতায়।

সাম্প্রদায়িক সীমা অতিক্রম করে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ সেদিন যোগ দিয়েছিলেন ধর্মঘটে; ঘটনাটা অভিভূত করেছিল অনেককেই। সলিল চৌধুরীর সেই বিখ্যাত গান '*ঢেউ উঠছে কারা টুটছে*' লেখা হয়েছিল এই দিনটি নিয়েই। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর এ এক অভূতপূর্ব প্রকাশ—ঘটনাটাকে এইভাবেও দেখতে চেয়েছিলেন কেউ কেউ। অথচ সেই দিনই বম্বেতে সারা ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভায় ঘোষিত হচ্ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা 'ডিরেক্ট অ্যাকশন'-এর আহ্বান। আঠার দিন পরে ১৬ অগাস্ট এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামেই এক অকল্পনীয় হিংসার তাণ্ডব শুরু হবে কলকাতায় বীভৎস ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে শহর; তারপর টানা এক বছর ধরে বিচ্ছিন্নভাবে দাঙ্গা চলতে থাকবে কলকাতায়।

২৯ জুলাইয়ের পর ১৬ অগাস্টের কথা বলতে গিয়ে অনেকেই, বিশেষত কমিউনিস্টরা, বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিণতি যে এরকম হবে, তা তাঁরা আগে বুঝতে পারেননি। কুমুদ বিশ্বাসের কথায় : '১৬ অগাস্টের আগে বুঝতে পারিনি যে এরকম হবে।' সমর মুখোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তি : 'যদিও আগের দিন মুসলিম এলাকায় প্রচার করি, বৈঠক করি, কিন্তু এত বীভৎস দাঙ্গা হবে তা ভাবিনি।'[১]

কমিউনিস্টদের এই ভাবনার প্রধান ভিত্তি নিঃসন্দেহে ২৯ জুলাইয়ের সাফল্য। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই দেখা যেত, মুসলমান শ্রমিকরা ওই দিন ধর্মঘটে যোগ দিলেও মুসলিম লীগ ঘটনাটা ভালো চোখে দেখেনি। ৩০ জুলাই ধর্মঘটের কারণে সংবাদপত্র বন্ধ ছিল। ৩১ জুলাই কলকাতার লীগপন্থী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'-এর প্রথম সংবাদ-শিরোনাম হয়—ধর্মঘট নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত : Historic Decisions Made at Bombay; দ্বিতীয় খবর হিসাবে ধর্মঘটের উল্লেখ করে বলা হয়, প্রধানত গুণ্ডাদের হুমকি আর চাপের ফলেই—largely due to coercion and threats of hooliganism—সফল হয়েছে ধর্মঘট। মুসলিম লীগ ওই 'ঐতিহাসিক' ধর্মঘটকে কী চোখে দেখেছিল, তার একটা স্পষ্ট ইংগিত এ থেকে পাওয়া যায়।

১। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, 'উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব', পৃ ১৯১ - ৯২

দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার খবরটি সব সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং অশুভ একটা ইংগিতও পাওয়া গিয়েছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কারণ হিসাবে লীগ দায়ী করেছিল কংগ্রেসের একরোখামি আর ব্রিটিশের বেইমানিকে : intransigence of the Congress on the one hand and the breach of faith with the Muslims by the British Government on the other. বলা হয়েছিল, মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদে এবং 'স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র' অর্জনের স্বার্থে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিচ্ছে মুসলিম লীগ কাউন্সিল এবং আসন্ন সংগ্রামের জন্য তৈরি থাকতে বলা হচ্ছে মুসলমানদের : This council directs the working committee to prepare forthwith a programme of direct action to carry out the policy initiated above and to prepare the Muslims for the coming struggle as and when necessary.

কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণা কেবল এইটুকুই ছিল না; পরিষ্কার একটা হুমকিও মিশে ছিল জিন্নাহর বিবৃতিতে : এতদিন ব্রিটিশ মেশিনগান আর কংগ্রেস অসহযোগের অস্ত্র দিয়ে আমাদের শাসিয়েছে; এবার আমাদের হাতেও অস্ত্র[১] এসে গেছে : Today we have also forged a pistol and are in a position to use it.[২]

এরপর আয়োজন শুরু হয়ে যায় পরের দিন থেকেই। বাঙলার লীগ সভাপতি নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন, আর দেরি নয়, সময় এসে গেছে : The time for the test has come. কলকাতায় গঠন করা হয় মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড। প্রতিটি জেলায় খোলা হয় প্রশিক্ষণ শিবির। বাঙলার লীগ প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দি মুসলমান যুব সমাজকে সর্বশক্তি নিয়ে প্রস্তুত হবার আহ্বান জানান : Marshal all your forces under the banner of the Muslim League।[৩] বিয়াল্লিশের আন্দোলনে কংগ্রেস যেমন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'-র চূড়ান্ত স্লোগান দিয়েছিল, লীগও তেমনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে শেষ যুদ্ধের স্তরে নিয়ে যাবার সংকল্প নেয়। কংগ্রেসের স্লোগানই ফিরে আসে লীগের ঘোষণায় কংগ্রেসকে দিয়ে হিন্দু সরকার গঠন করানো হলেই মুসলমানদের সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে : that will be the signal for Muslims to do or die.[৪]

৩১ জুলাই থেকে ১৬ অগাস্ট 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার পাতা ওল্টালে একটা চক্রান্ত কিভাবে দানা বাঁধছে, দাঙ্গার একটা ছক কিভাবে তৈরি হচ্ছে, তার একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায় :

১ অগাস্ট : নাজিমুদ্দীন মুসলমান যুবকদের আর বিলম্ব না করে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দেবার আহ্বান জানাচ্ছেন।

১। জিন্নাহর জীবনীকার আয়েশা জালাল বলেছেন, পিস্তলের কথাটা জিন্নাহ 'রূপকার্থে' ব্যবহার করেছিলেন; কিন্তু তাঁর গ্রন্থেই বলা আছে—কলকাতাকে পাকিস্তানের মধ্যে পাওয়ার জন্যে জিন্নাহ 'দারুণ হাঙ্গামা'-র (serious trouble) মধ্যে যেতে রাজি ছিলেন। (Jalal, op cit. pp 213, 175)

২। *Amrita Bazar Patrika*, July 31, 1946

৩। *Morning News*, August 1, 5, 1946

৪। Anita Inder Singh, *The Origins of the Partition of India*, p 181

২ অগাস্ট : জিন্নাহকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ কেমন হবে। জিন্নাহ জানাচ্ছেন, তিনি নীতিশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে চান না : I'm not going to discuss ethics.

৪ অগাস্ট : মৌলনা আকরম খান ঘোষণা করছেন, পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।

৫ অগাস্ট : মুসলিম ইনস্টিটিউটে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সমাবেশ। 'পবিত্র কোরহান এবং ইসলামের নির্দেশ' অনুসরণ করার আহ্বান জানাচ্ছেন নাজিমুদ্দীন।

৬ অগাস্ট : ১৬ অগাস্ট সাধারণ ধর্মঘট এবং হরতাল পালনের আহ্বান।

৮ অগাস্ট : ১৬ অগাস্ট ছুটির দিন ঘোষণা করা হচ্ছে।

৯ অগাস্ট : প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি ঘোষণা করছেন লীগ নেতা, কলকাতার মেয়র, মহম্মদ উসমান। মিছিল করে ময়দানে যাওয়া হবে। জমায়েত দুপুরে। সমস্ত শক্তি নিয়ে সমবেত হয়ে ওই জমায়েতকে সফল করে তোলার আহ্বান জানানো হচ্ছে : to muster strong at the Maidan Meeting and make it a historic rally; আরও জানা যাচ্ছে, ১৬ অগাস্ট প্রতিটি মসজিদে লীগের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

১১ অগাস্ট : প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিশদ কর্মসূচি ঘোষণা করা হচ্ছে; শেষ করা হচ্ছে এই বলে যে, লীগের এটা পরম সৌভাগ্য যে এই রমজান মাসেই সংগ্রাম শুরু হবে; কারণ এই রমজান মাসেই তো জেহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ : It was in Ramzan that permission for jehad was granted by Allah.

১৪ অগাস্ট : মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের ১৬ তারিখে সকাল ৮-৩০-এর মধ্যে মুসলিম ইনস্টিটিউটে সমবেত হতে বলা হচ্ছে। তাদের পরণে থাকবে খাকি পোশাক, মাথায় সালার টুপি।

১৫ অগাস্ট : রেলওয়ে কর্মীদের নিয়ে মুসলিম ন্যাশনাল কোর গঠন করা হচ্ছে। লীগ নেতা নুরুল হুদা ঘোষণা করছেন, আর শ্লোগান নয়, এখন চাই অ্যাকশন : No more slogans. The clarion call has come for action and nothing but action.

১৬ অগাস্ট : সম্পাদকীয় আহ্বান : 'মনে রেখো, শুক্রবার ১৬ অগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে হবে, মুসলমানরা পাকিস্তান দাবিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।' দিনটি শান্তিপূর্ণ রাখার আহ্বানও অবশ্য থাকছে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ কেমন হবে, লীগ নেতারা কেউই তা স্পষ্ট করে বলতে রাজি হননি। নাজিমুদ্দীন একবার বলে ফেলেছিলেন, লীগ অহিংসায় বিশ্বাস করে না : We are not restricted to non-violence; কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছিল যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হবে। ১৬ অগাস্ট মর্নিং নিউজেও লেখা হয়, যারা ধর্মঘটে যোগ দেবে না তাদের ওপর যেন কোন জোর-জুলুম না করা হয়। অথচ তলায় তলায় ভয়ানক এক প্রস্তুতি চলছিলই। একদিকে সোহরাবর্দি আশ্বাস দিচ্ছিলেন, লীগ

হিংসা বা হুমকির আশ্রয় নেবে না, জিন্নাহ্ আবেদন জানাচ্ছিলেন দিনটি 'শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে' পালন করতে;[১] অন্যদিকে মহম্মদ উসমান প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন অত্যন্ত উত্তেজক ভাষায় লেখা উর্দু প্রচারপত্র। 'প্রবাসী' পত্রিকার ('আশ্বিন ১৩৫৩) বিবরণ অনুযায়ী, এ রকম 'লক্ষ লক্ষ উত্তেজনাপূর্ণ প্রচারপত্র' বিলি করা হয়েছিল দাঙ্গার আগে।

একটি প্রচারপত্রের ভাষা ছিল এ রকম : 'আশা ছেড়ো না। তরোয়াল তুলে নাও। ওহে কাফের, তোমার ধ্বংসের দিন বেশি দূরে নয়।' প্রচারপত্রটিতে ছাপা হয়েছিল তরবারি হাতে জিন্নাহ্‌র ছবি।[২]

আর একটি প্রচারপত্রে বলা হয়েছিল, 'আল্লার ইচ্ছায় পাকিস্তান লাভের জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এই রমজান মাস ঠিক করিয়াছেন;' এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল : 'এই রমজান মাসেই ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়।'[৩]

উত্তেজনা প্রচারের ভাষায়, সংগ্রামের আহ্বানে ধর্মীয় অনুষঙ্গের ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাফল্যের জন্যে মসজিদে-মসজিদে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থাও করা হয়।[৪] বঙ্গীয় আজাদ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান পরে লিখেছিলেন, 'ধর্মের দোহাই দিয়া এই দাঙ্গায় মুসলমানগণকে উত্তেজিত করানো হইয়াছে।'[৫]

২৯ জুলাইয়ের পর থেকে কলকাতায় যখন এইভাবে এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতি চলছে, দিল্লিতে তখন প্রস্তুতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের। কংগ্রেস নেতারা ভীষণ ব্যস্ত তাই নিয়ে।

লীগের ঘোষণা শুনেই ব্রিটিশ বুঝতে পেরে গেছে, খারাপ কিছু ঘটবে : League resolution will cetainly increase communal tensions in the towns.[৬] দেশজুড়ে তখন এমনিতেই যথেষ্ট গণ-অসন্তোষ রয়েছে। ১৯৪৫-এ শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা যেখানে ছিল ৮২০, ১৯৪৬-এ তা দাঁড়িয়েছে ১৬২৯।[৭] ছাত্র-যুবকদের মধ্যেও যথেষ্ট ক্ষোভ আছে। এরপর তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আশঙ্কা। অবস্থা বুঝে ব্রিটিশ এখন কংগ্রেসকে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্তর্বর্তী সরকারটা গঠন করিয়ে ফেলতে চায়, কারণ তার ধারণা, কংগ্রেসই পারবে এই গণ-অসন্তোষ ঠেকাতে।[৮]

৬ অগাস্ট বড়লাট ওয়াভেল তাই নেহরুকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন এবং এ বিষয়ে লীগের সঙ্গে আলোচনার জন্য অনুরোধ করছেন। নেহরু আশ্বাস দিয়ে বলছেন, তিনি চেষ্টা করবেন লীগকে রাজি করাতে; না পারলে তাদের বাদ দিয়েই এগিয়ে যাবেন।[৯]

১। *Amrita Bazar Patrika*, August 12, 1946
Hindusthan Standard, August 16, 1945
২। Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p 213
৩। Quoted in Bengali translation in *Pravasi*, Aswin 1353 BS
৪। *Calcutta Municipal Gazette*, August 17, 1946, p 362
৫। 'প্রবাসী,' আশ্বিন ১৩৫৩
৬। 'Wavel to Lawarence, July 31', *The Transfer of Power* ed by N Mansergh, Vol. VIII, p 154
৭। G. Ramanujam, *Story of Indian Labour*, p 253
৮। Mansergh, *op cit*, p 154
৯। Anita Inder Singh, *op cit*, p 180

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে যে একটা ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে কোন চিন্তাই নেহরুর নেই। ১০ অগাস্ট তিনি বরং বলতে পারছেন, লীগ সরকার গঠনের পথে গিট পাকাচ্ছে; আমরা গিট খোলার চেষ্টা করব, না পারলে কেটে দেব : We shall try to untie those knots. But if those knots prove obstinate, we will cut them.[১]

১৫ অগাস্ট নেহরু জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করলেন; আশি মিনিট ধরে কথা হল; অথচ কী নিয়ে কথা হল নেহরু বলতে রাজি নন। অদ্ভুত এক নীরবতা দিল্লির কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে। অথচ কলকাতার পরিস্থিতি যে তাদের অজানা এমন নয়। মৌলনা আজাদ লক্ষ্য করেছেন, ১৬ অগাস্ট ছুটির দিন ঘোষিত হওয়ায় হিন্দুদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায় এরকম একটা কথা চালু হয়ে গেছে যে, লীগ কর্মীরা ওই দিন কংগ্রেসীদের আক্রমণ করবে এবং লুঠপাট করবে কংগ্রেসের সম্পত্তি।[২]

লীগ নেতাদের প্ররোচনাময় বিবৃতি এবং ১৬ অগাস্ট ছুটির দিন ঘোষণা করায় কলকাতায় তখন প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রাদেশিক আইন পরিষদে ছুটি ঘোষণার বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভার প্রস্তাব ৩১-১৩ ভোটে নাকচ হয়ে যায়, কিন্তু প্রচণ্ড তর্কাতর্কি হয় তাই নিয়ে। কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহার বলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আসলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় সদস্য জি. মরগান বলেন, যে হাঙ্গামার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক থাকতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার অভিযোগ করেন, বাঙলার সরকার লীগের সাব কমিটির মতো কাজ করছে। হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস ১৬ অগাস্ট ধর্মঘট বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৪ তারিখে দেশপ্রিয় পার্কের এক জনসভায় বাঙলার কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি অবশ্য হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই প্ররোচনার ফাঁদে পা না দেবার জন্যে সতর্ক করে দেন।[৩]

সুতরাং ১৬ অগাস্ট কী ঘটতে যাচ্ছে তার কোন পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি, এ কথা আদৌ সত্য নয়। ১৬ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : উদ্বিগ্ন হবার মতো কারণ যথেষ্টই আছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে হুমকির খবর পাওয়া গেছে। কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতাতে'তেও ওই দিন 'ঘরোয়া লড়াই এবং ব্যাপক দাঙ্গার' আশঙ্কা প্রকাশ করে এর বিরুদ্ধে 'মিলিত সংগ্রামের' আহ্বান জানানো হয়।

১৫ অগাস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের একটি সভায় বামপন্থী ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন লীগের ডাকা ধর্মঘট সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়; ১৬ অগাস্ট লীগের মিছিলে যোগদানের পক্ষেও কেউ কেউ মত দেন। যুক্তি ছিল, 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম এবং শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থেই' এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে; ধর্মঘটের

১। *Amrita Bazar Patrika*, August 11, 1946

২। Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, p 168

৩। *Hindusthan Standard*, August 15-16, 1946

বিরোধিতা করলে শ্রমিকদের মধ্যেই দাঙ্গা লেগে যেতে পারে।[১] এই যুক্তি খুব গ্রহণযোগ্য বলা যায় না; বরং ওই রকম একটি উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে ধর্মঘট সমর্থন করে কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন কতটা দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিল, সে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। তবে সিদ্ধান্তটি তর্কাতীত ছিল না। ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা গোপাল আচার্য জানিয়েছেন, ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে পার্টি কর্মীদের মধ্যে মতভেদ ছিল।[২]

কমিউনিস্টদের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আর একটি কারণ, লীগের প্রতি তাদের মনোভাবে তখন কিছুটা দোদুল্যচিত্ততা ছিল। ইতিপূর্বে (১৯৪৩) মুসলমানদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্রের দাবি স্বীকার করে নিয়ে কমিউনিস্টরা লীগের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। লীগও সম্ভবত কমিউনিস্টদের হাতে রাখতে চেয়েছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ঠিক আগের দিনই যে বাঙলার লীগ সরকার বন্দী বিপ্লবীদের মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে,[৩] সে তথ্যটিও খেয়াল করার মতো। বন্দীদের মধ্যে তখন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, নলিনী দাসের মতো কমিউনিস্টরাই সংখ্যায় বেশি ছিলেন। কমিউনিস্টদের হাতে রাখার কথা ভেবেই লীগ সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এমন মনে করার কারণ আছে।

দেখা যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিণাম কী হতে পারে তার ইঙ্গিত নানাভাবেই পাওয়া গিয়েছিল; রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্তও নিয়ে নিয়েছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশরাজেরও।

ব্রিটিশের অবস্থান

২৯ জুলাইয়ের পরের দিনই মিশন প্রতিনিধি লরেন্স ওয়াভেলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার ফলে এক 'অভূতপূর্ব এবং গুরুতর' (novel and serious) পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।[৪] সেনাবাহিনীর ভেতরও কথাটা চালু হয়ে গিয়েছিল এবং সেইমতো কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। অধ্যাপক এ. ডবলিউ. মাহমুদ তখন সেনাবিভাগে কাজ করতেন। অগাস্টের গোড়াতেই তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার বাসা থেকে চৌরঙ্গী অঞ্চলের সাহেবপাড়ার একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ জানতে চাইলে বলা হয়েছিল, ব্রিটিশ তাকে জ্যান্ত পুড়ে মরতে দিতে পারে না।[৫]

দাঙ্গার বেশ কয়েকমাস পরে প্রকাশিত এক বিদেশী সাংবাদিকের লেখা থেকে জানা যায়, ১৪ অগাস্ট ব্যারাকপুরের মিলিটারি ব্যারাকে সেনাবাহিনীর অফিসারদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দাঙ্গা শুরু হলে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করবে না : When the riot begins, we will not interfare. If the people want swaraj (self

১। *Amrita Bazar Patrika*, August 16, 1946 ;
সুধী প্রধান, সাক্ষাৎকার মার্চ, ১৯৯১; শিশির মিত্র, 'কালান্তর', পত্রিকা ৭ অগাস্ট, ১৯৯২

২। 'নাগরিক মঞ্চ বুলেটিন', ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

৩। *Hindusthan Standard, August* 16, 1946

৪। Mansergh, *op cit*, p 143

৫। এ. ডবলিউ. মাহমুদ, সাক্ষাৎকার, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯১

rule) let them fight for it.[১] এই সিদ্ধান্তই ব্রিটিশের গৃহীত নীতি ছিল মনে করা যেতে পারে। দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নেওয়ার পরও সেনাবাহিনী নামাতে কেন দেরি করা হয়েছিল, তার কারণটাও এ থেকে খুঁজে পাওয়া যায়।[২]

হিন্দুদের প্রস্তুতি

ব্রিটিশ তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অবস্থান ঠিক করে ফেলেছিল আর নিচের তলায় দু-পক্ষই তৈরি হচ্ছিল তাদের ক্যাডারবাহিনী নিয়ে। লীগ প্রচারিত উর্দু প্রচারপত্রের জবাবে হিন্দু মহাসভাও হিন্দুদের তৈরি হবার ডাক দিয়ে প্রচারপত্র বিলি করতে শুরু করে। 'হিন্দু সেবক সঙ্ঘ' নামে একটি সংগঠনও পোস্টার লাগায়। একটি প্রচারপত্র শুরু হয়েছিল: 'সাবধান! ১৬ অগাস্ট'—এই হুঁশিয়ারি দিয়ে। নির্দেশ ছিল, লীগের ডাকা ধর্মঘট ভাঙতে হবে; লীগ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার সমুচিত জবাব দিতে হবে হিন্দুদের : The Hindus will have to give a clear reply to the highhandedness of the Muslim League.[৩]

পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব এবং ব্যায়াম সমিতিগুলোর ওপর তখন হিন্দু মহাসভার একটা প্রভাব ছিল। কোন কোন অঞ্চলে মহাসভা ক্লাবগুলোকে ইউনিফর্ম এবং খেলার সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করত। বিভিন্ন আখড়া-ক্লাব-সমিতির যুবকদের নিয়ে এইভাবে প্রস্তুতি শুরু হয় হিন্দুদের মধ্যে। কোন কোন অঞ্চলে হাতবোমাও তৈরি করে রাখা হয় আগাম প্রস্তুতি হিসাবে। যে সব বেকার ছেলে গোয়েন্দা পুলিশের চর হিসাবে কাজ করত, তাদের কাছ থেকেই খবর সংগ্রহ করেছিল পাড়ার 'দাদা'-রা।[৪] মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন, লীগের ডাকা মিছিল থেকে 'কিছু একটা অঘটন ঘটবে এটা সবাই অনুমান করেছিল। সুতরাং হিন্দুরাও পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হলো।'[৫]

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির বিবরণ : শিয়ালদহে বৈঠকখানা অঞ্চলে দপ্তরিদের মধ্যে তখন বেশির ভাগই ছিল মুসলমান। ১৬ অগাস্টের কদিন আগে থেকেই তাদের আচরণ সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল। পাড়ার হিন্দু যুবকরা তাই আমহার্স্ট স্ট্রীটের (রামমোহন রায় সরণি) একটি শিবমন্দিরে লাঠি-মুগুর জড়ো করে রাখে। বাড়ির ছাদে মজুত রাখা হয় প্রচুর ইট-পাথর।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

১। Quoted in *Modern Review*, July 1947

২। সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার পরে জানিয়েছিলেন, গোয়েন্দা পুলিসের কাছে খবর ছিল— হাঙ্গামা হতে পারে। পূর্বাঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ বুচার তাঁকে সতর্কও করে দিয়েছিলেন। (প্যারেলাল, মহাত্মা গান্ধী, পৃ. ২৫৩ - ৫৪)

৩। Quoted in English translation in *Harun-or Rashid*, *'The Fore-shadowing of Bangladesh'*, Dhaka, 1985, p 260

৪। মৌখিক সূত্র : ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়; ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর; . গোপাল মুখোপাধ্যায়, বউবাজার

৫। মণিকুন্তলা সেন, 'সেদিনের কথা', পৃ. ১৭০ - ৭১

ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে'—নাজিমুদ্দীনের এই ঘোষণার পরই হিন্দুরা ভেতরে ভেতরে তৈরি হতে থাকে। আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্যও তাই : নাজিমুদ্দীনের প্ররোচনাময় বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায় 'হিন্দুরা সন্ত্রস্ত এবং শেষ পর্যন্ত এগ্রেসিভ হইয়া উঠিল।'[১]

হিন্দুরা অতর্কিতে এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হয়েছিল, বহুলপ্রচলিত এই ধারণাটি একেবারেই ঠিক নয়। প্রস্তুতি তাদের দিক থেকেও ছিল।[২] বিজয় সিং নাহার জানাচ্ছেন, ১৬ তারিখের কদিন আগে থেকেই পাড়ার কয়েকটি বাড়িতে কেরোসিন তেল এবং ছোট ছোট ন্যাকড়ার বল জমা করে রাখা হয়। নির্দেশ ছিল, পাড়া আক্রান্ত হচ্ছে দেখলে ওই বলগুলো কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে আক্রমণকারীদের ওপর ছুঁড়ে দিতে হবে। ১৬ অগাস্ট তাঁর অঞ্চল ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটে এক মারমুখী মুসলমান জনতা ঢুকে পড়লে ওই পদ্ধতিতেই তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শ্রীনাহার নিজে লাঠি হাতে জনতার সামনে রুখে দাঁড়ান।[৩]

সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থে[৪] বিভিন্ন গোপন সূত্র উদ্ধৃত করে দাঙ্গার প্রস্তুতির যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা রীতিমতো রোমহর্ষক : গুণ্ডা-অধ্যুষিত বস্তিতে-বস্তিতে লীগ নিয়মিত সভা করে দাঙ্গার কয়েকদিন আগে থাকতে; প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দি নিজে উপস্থিত থাকেন। কামারদের দিয়ে ছোরা-বল্লম ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করিয়ে নেওয়া হয়; ছোরাছুরি শান দেওয়ার কাজ চলতে থাকে। মুসলমান ছাত্রদের হোস্টেলে কেরোসিন, মেথিলেটেড স্পিরিট ও অস্ত্র জমা করা হয়। মধ্যবিত্ত হিন্দু বাড়িতে ইট-পাথর-লাঠি মজুত রাখা হয়। মাড়োয়ারি ব্যবসাদাররা অস্ত্র কিনে রাখে। শিখরা তৈরি হয়। দুই সম্প্রদায়ই বাইরে থেকে গুণ্ডা ভাড়া করে আনে। মুসলমানদের দোকানে দাগ দিয়ে রাখা হয়, যাতে সেগুলো লুঠপাটের শিকার না হয়। সরকারের তরফ থেকে লীগ ক্যাডারদের পেট্রল-কেরোসিন জোগান দেওয়া হয়। মসজিদে মসজিদে সভা চলতে থাকে। বেশিরভাগ থানা থেকেই হিন্দু পুলিস অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এক কথায় পুরোদস্তুর একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি।

কলকাতার প্রবীণদের মনে আজও দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে আছে সেইসব স্মৃতি। মুসলমান কামারকে দিয়ে চুপি চুপি অস্ত্রের একটা প্রত্যঙ্গ তৈরি করিয়ে নিচ্ছে হিন্দু যুবক—দেখেছেন শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত। ভবানীপুরের নর্দার্ন পার্কের সব রেলিং কে বা কারা খুলে নিয়ে গেছে ১৬ তারিখের কদিন আগে—মনে করতে পারেন অধ্যাপক এ. ডবলিউ মাহমুদ। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-হ্যারিসন রোডের মোড়ে একটা মুসলমানের দোকানে ছুরি শান দেওয়া হচ্ছে—নিজে দেখেছেন মন্মথনাথ দত্ত। কিছু ইঙ্গিত কলকাতার মানুষ এইভাবেই পেয়ে যান। পাড়ায় পাড়ায় লীগ ক্যাডাররা লরিতে করে ঘুরে চিৎকার করে স্লোগান দেয় : *আল্লা হো আকবর। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।*
১৫ তারিখ রাতে কলকাতা ঘুমোতে যায় এক গভীর আতঙ্ক বুকে নিয়ে।

১। বদরুদ্দীন আহমদ, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী', পৃ. ২৫;
আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', পৃ. ২৫৩

২। ১৯৪৬-এর জানুয়ারিতেই শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন : 'Civil War আমরা চাই না—কিন্তু যদি অপর পক্ষ তৈরি হয়ে ওঠে আর আমরা প্রস্তুত না থাকি তাহলে আমরাই ঠকব শেষ পর্যন্ত।' (শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ, পৃ. ৭৪)

৩। বিজয় সিং নাহার, সাক্ষাৎকার ১০ মার্চ ১৯৯২

৪। Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal*, pp 177-79, 180-85

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

কলকাতা : ১৬ আগস্ট

ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গা শুরু হয়েছিল ১৬ অগাস্ট; নৃশংসতম এক ভ্রাতৃহত্যার তাণ্ডব চলেছিল পুরো চারদিন—১৯ তারিখ পর্যন্ত। তারপরও বিক্ষিপ্তভাবে দাঙ্গা চলতে থাকে।

১৬ অগাস্ট মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করে এবং ধর্মঘটের ডাক দেয়। কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভা ধর্মঘটের বিরোধিতা করে; সংঘর্ষের সূত্রপাত এইখান থেকেই। হিন্দুরা দোকানপাট খোলা রাখার চেষ্টা করে; লীগ ক্যাডাররা দোকান বন্ধ করার জন্যে জোরজুলুম চালায়।[১]

হাঙ্গামার প্রথম ঘটনাটি ঘটে সকাল ৬টা নাগাদ, উত্তর কলকাতার মানিকতলা ব্রিজে। এক গোয়ালাকে মারধর করা হয় এবং তার দুধের পাত্র ফেলে দেওয়া হয়। এরপর আক্রান্ত হয় মানিকতলা মোড়ে দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামে একটি দোকান। স্থানীয় একটি মসজিদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে একদল লীগ ক্যাডার লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। বিবেকানন্দ রোড-আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে একটি শীতলা মন্দির ও কয়েকটি দোকানের ওপরও আক্রমণ হয়, তবে কালোয়ার ব্যবসাদাররা বাধা দেওয়ায় হাঙ্গামা সেখানে বেশিদূর ছড়াতে পারেনি। দোকানপাটের ওপর হামলা অন্যান্য অঞ্চলেও চলতে থাকে : 'দোকানের লোকদের প্রহার ও ছুরিকাঘাতও ভোর না হইতেই শুরু হইয়া যায়।'[২]

হাসপাতাল রেকর্ড থেকে জানা যায়, মেডিক্যাল কলেজে প্রথম আহত ভর্তি হয়েছিল সকাল ৭-১৫-য়; নুর মুহম্মদ নামে এক কাঠের মিস্ত্রি; দোকান বন্ধ করতে রাজি হয়নি বলে তাকে ছুরি মেরেছিল মুসলিম লীগের লোকেরাই, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীটে। এরপর দ্বিতীয় ভর্তি সকাল ৭-৩৫-এ; হিন্দু। ক্যাম্পবেল (নীলরতন সরকার) হাসপাতালে প্রথম ভর্তি এক হিন্দু, সময় সকাল ৯টা। কারমাইকেল (আর. জি কর) হাসপাতালে প্রথম ভর্তিও এক হিন্দু; সময় সকাল ৭-৪৫।[৩]

দেখা যাচ্ছে, দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল সকাল থেকেই। তবে প্রথম দিকে তা ছিল বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা, সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত উত্তর কলকাতায়। একটি অঞ্চলের মানুষ

১। ব্রিটিশ লেখক লিওনার্ড মোশলের বিবরণ : ভোরবেলাতেই হাওড়ার একদল গুণ্ডা লাঠি, ছুরি, লোহার রড নিয়ে কলকাতায় চলে আসে এবং যারা দোকান খোলা রেখেছিল, তাদের মারধোর করে, ছুরি মারে। (*The Last Days of the British Raj*, pp 28-29)

২। 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৫৩; 'হিন্দু', ৪ আশ্বিন ১৩৫৩

৩। উদ্ধৃত হয়েছে : 'মডার্ন রিভিউ', সেপ্টেম্বর ১৯৪৬' 'প্রবাসী', কার্তিক ১৩৫৩

তখনও জানতেও পারেননি অন্যান্য অঞ্চলে কী ঘটছে। সকাল ৯টা নাগাদ হেদুয়া থেকে হেঁটে ওয়েলিংটন পর্যন্ত গিয়েছিলেন সুধী প্রধান, তিনি কোন হাঙ্গামা দেখেননি। বেলা ১২টা নাগাদ বেলগাছিয়ার ওলাইচণ্ডীতলা থেকে হেঁটে শ্যামবাজারে আসেন নিত্যরঞ্জন সেন। কারমাইকেল হাসপাতালের সামনে ছুরিকাহত কয়েকজন মুসলমানকে তিনি দেখতে পান; কিন্তু রাস্তায় কোন হাঙ্গামা ছিল না, তাঁকেও কেউ আক্রমণ করেনি। শোভাবাজারে ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা : সকালে পাড়া থমথমে ছিল তবে দাঙ্গার কোন পূর্বাভাস ছিল না। এন্টালিতে একই রকম অবস্থা দেখেন বিরাজমোহন ঘোষ।

অথচ হাঙ্গামা কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বেলা ১১টা নাগাদ টালা ব্রিজের উত্তর দিক থেকে লীগের এক বিশাল মিছিল বাজনা বাজিয়ে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিয়ে শ্যামবাজারের দিকে আসতে থাকে। টালা অঞ্চলে দু-একটা হিন্দু বাড়িতে তারা আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। বাগবাজারের অধ্যাপক গৌরীনাথ শাস্ত্রীর বাড়ি আক্রান্ত হয়েছিল; সেখানে হিন্দুরা মিছিলটিকে আক্রমণ করলে মারামারি লেগে যায়। শিয়ালদহে রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে লীগ ঝান্ডা নামিয়ে তেরঙা পতাকা তোলা হলে হলে ইট ছোঁড়াছুঁড়ি এবং দোকান ভাঙচুর শুরু হয়ে যায়। গোলমাল শ্যামবাজার-মানিকতলা ছাড়িয়ে রাজাবাজার-শিয়ালদহ-মির্জাপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। দুপুরের মধ্যেই শহরের উত্তর, মধ্য এবং পূর্ব অঞ্চল থেকে লুঠপাট এবং ছুরি মারামারির খবর—reports of looting, stabbing and rioting—আসতে থাকে।[১] মৃত বা আহত ব্যক্তিদের খোলা লরিতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই দৃশ্য স্বভাবতই মানুষকে আরও উত্তেজিত করে।

এরপর ময়দান অভিমুখে লীগের মিছিল শুরু হয় দুপুর থেকে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিল এসে মুসলিম ইনস্টিটিউটে জড়ো হয়ে ময়দানের দিকে যায় মূল মিছিলটি। মিছিলকারীরা সশস্ত্র ছিল। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তাদের হাতে লাঠি আর মুগুর ছিল। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার (১৭ অগাস্ট) বিবরণে অবশ্য বলা হয়, তাদের হাতে ছোরা ছিল এবং আহতদের দেহে গুলির আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গেছে। গভর্নরের রিপোর্টেও শটগানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মিছিল যেমন সশস্ত্র এবং জঙ্গি ছিল, তার ওপর আক্রমণও হয়েছিল। শিয়ালদহে হিন্দুরা বাড়ির ছাদ থেকে মিছিলের ওপর ইট ছুঁড়ছে, এ দৃশ্য নিজে দেখেছেন সোমনাথ লাহিড়ী। মেছুয়াবাজারে তিনি দেখতে পান, কয়েকজন মুসলমান মারাত্মক সব অস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে আছে।[২] তবে, হিন্দুরা মিছিলের ওপর আক্রমণ না করলে দিনটা 'বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে' কেটে যেত—তাঁর এই ধারণা ঠিক নয়; মিছিল শুরু হবার

১। *The Indian Annual Register*. Vol, II, 1946, pp 182-83, *Amrita Bazar Patrika*, August 17,1946;
মৌখিক সূত্র : মীরা মুখোপাধ্যায়, টালা; অজিত বসু, শ্যামবাজার

২। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, 'উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব', পৃ. ১৮১-৮২

আগেই, আমরা জেনেছি, উত্তর কলকাতায় ছুরি-মারামারি শুরু হয়ে গিয়েছিল। দাঙ্গার এক ব্যাপক প্রস্তুতি যে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, তার বিশদ বিবরণও আমরা আগের অধ্যায়ে পেয়েছি।

তবে মিছিলের ওপর ঢিল ছোঁড়া নিঃসন্দেহে প্ররোচনার কাজ করেছিল। হাওড়া ব্রিজে মুসলমানদের ধরে ধরে কেটে ফেলা হচ্ছে—এই গুজবও উত্তেজনা ছড়াতে সাহায্য করে। হাওড়ায় মিছিল যাওয়ার পথেই পারস্পরিক আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু মহাসভার ক্যাডাররা ঢিল ছোঁড়ে, পালটা আক্রমণ করে লীগের দল। দক্ষিণ কলকাতায় রসা রোডেও হিন্দুরা মিছিলের ওপর ঢিল ছোঁড়ে এবং 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর জবাব দেয় 'নেহী দেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি দিয়ে।[১]

১৬ অগাস্টের যে বিবরণ এ পর্যন্ত আমরা পেলাম, তাতে দেখা যাচ্ছে, সকাল থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম আক্রমণটা এসেছিল লীগের তরফ থেকেই; তবে কোন কোন অঞ্চলে হিন্দুরাও পালটা দিতে শুরু করে। সুতরাং প্রথমে মুসলমানদের পক্ষ থেকে একতরফা 'নরহত্যা লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের পর হিন্দু ও অন্যান্য লোকেরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে'—'প্রবাসী'-র (আশ্বিন, ১৩৫৩) এই মন্তব্য ঠিক নয়। অন্যদিকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে[২] যে অভিযোগ করা হয়েছে, হিন্দুরাই প্রথমে আক্রমণ করে, তা-ও একেবারেই ঠিক নয়। আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ প্রথম থেকেই ছিল। নির্মলকুমার বসুর ভাষায় : The offensive began from the side of the Muslim mobs; but within a few hours the Hindus ... also struck back . দাঙ্গার কয়েকদিন পরেই প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় একই রকম মন্তব্য করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৩] ব্রিটিশ সরকারের একটি গোপন নোটের বক্তব্য ছিল আরও পরিষ্কার : মুসলমানরা সকাল থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল। হিন্দুদের দোকান বন্ধ করার জন্যে জোরজুলুম শুরু হলে হিন্দুরাও ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে; বোঝা যাচ্ছে, তারাও একেবারে অপ্রস্তুত ছিল না।[৪]

১। ঐ, পৃ. ১৯২; শান্তিময় রায়, 'গণদর্পণ' [পত্রিকা], অগাস্ট ১৯৮৯;
পঞ্চানন ঘোষাল 'পুলিশ কাহিনী' (২য় খণ্ড), পৃ. ১৪৯

২। মহম্মদ আবদুর রহিম, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস', পৃ. ২৯৩-৯৪

৩। N. K Bose, *My Days with Gandhi*, p 32,
Soumendranath Tagore, *Resurgence of Tribal Savagery in Calcutta*, p 7

৪। *The Transfer of Power*, Vol. VIII, ed. by N Mansergh, pp 240, 295-96

ময়দানে লীগের সভা

দুপুর পর্যন্ত এই যে পরিস্থিতি, এটাকে আরও বিস্ফোরক করে তোলে ময়দানের সভায় লীগ নেতাদের বক্তৃতা। বক্তৃতার ভাষা অত্যন্ত জঙ্গি এবং আপত্তিকর ছিল। গভর্নরের গোপন নোটে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এ-রকম : সোহরাবর্দি পরিষ্কার বলেন, পুলিসকে নির্দেশ দেওয়া আছে, তারা হস্তক্ষেপ করবে না;এটা দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ প্ররোচনার কাজ করে : an open invitation to disorder. ষষ্ঠ জর্জকে লেখা বড়লাটের নোটে মন্তব্য করা হয়েছিল, লীগ নেতারা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তৃতা দিয়েছেন : unwise speeches (to say the least)।[১]

ময়দানের ওই সভায় উপস্থিত লীগ নেতা আবুল হাশিম তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, বাঙলার লীগ সভাপতি নাজিমুদ্দীন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন, আমাদের লড়াই কংগ্রেস আর হিন্দুদের বিরুদ্ধে। হাশিম নাজিমুদ্দীনকে ঠেলা দিয়ে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে অন্যান্য অঞ্চল থেকে দাঙ্গার খবর আসতে শুরু করেছে। সমাবেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।[২]

আর এক লীগ নেতা আবুল মনসুর আহমদের বিবরণ : সভায় প্রচার চালানো হয় বেহালা, কালীঘাট, মেটিয়াবুরুজ, মানিকতলা অঞ্চলে হিন্দুরা অনেক মুসলমানকে 'খুনজখম' করেছে। এরপর কয়েকজন আহত মুসলমানকে কাঁধে করে নিয়ে এসে দেখানো হয় এবং সেই দৃশ্য জনতাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে।[৩]

মিছিলকে কেন্দ্র করে মারদাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং কোন কোন অঞ্চলে হিন্দুরাও পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু সভায় যে প্রচারটা চালানো হয়, তার অনেকটাই গুজব;যেমন কালীঘাট, বেহালা, মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে তখনও কোন গোলমাল হয়নি। জনতাকে উত্তেজিত করে দাঙ্গায় মাতিয়ে তোলার জন্যেই ছড়ানো হচ্ছিল এইসব গুজব, এমন মনে করার কারণ আছে। প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল, কারণ এরপরই লীগ নেতারা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা লেগে গেছে বলে প্রচার করে সভা বন্ধ করে দিয়ে জনতাকে বাড়ি চলে যেতে বলেন। সভা ভেঙে যায় আর তারপরই ব্যাপকহারে শুরু হয় দোকানপাট লুঠ, পথচারীদের ওপর আক্রমণ। দাঙ্গা মারাত্মক রূপ নিতে শুরু করে এই সময় থেকেই।

ময়দানের সভায় উপস্থিত এক প্রত্যক্ষদর্শী জানাচ্ছেন, নেতারা সকলকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বলেন। ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে তিনি তালতলার দিকে আসছেন, দেখতে পান পথের দু'ধারে হিন্দুর দোকান লুট হচ্ছে। ওয়েলিংটনের মোড়ে এক হিন্দু চানাচুরওলাকে ধরে নৃশংসভাবে মারতে থাকে মিছিলের কিছু লোক।[৪] লুঠপাট-মারামারি ততক্ষণে

১। *Ibid*. p 297

২। Abdul Hashim, *In Retrospection*. p 116

৩। আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', পৃ. ২৫৫-৫৬

৪। মৌখিক সূত্র : এ. কে. মইদুল ইসলাম, তালতলা

ব্যাপক হয়ে উঠেছে। বেলগাছিয়ার এক কিশোর অশোক ঘোষ তার মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে ময়দানে গিয়েছিলেন। প্রচুর বাজি পুড়ছিল ময়দানে, প্যারাসুট নামছিল। ফেরার পথে তিনি দিখতে পান, কমলালয় স্টোর্স লুঠ হচ্ছে। ধর্মতলা অঞ্চলে ভাঙচুর হয় কে.সি.বিশ্বাসের বন্দুকের দোকান, সি.সি.সাহার গ্রামাফোনের দোকান, ওয়েলিংটনে কমলালয় স্টোর্স এবং রাধাবাজার-লালবাজার-টেরিটিবাজার অঞ্চলে আরও বেশ কিছু দোকান। 'প্রবাসী'-র ভাষায় : 'নিতান্ত পাশবিকভাবে লুণ্ঠন ও গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ চলিতে থাকে।'[১]

দোকানপাটের ওপর পাল্টা আক্রমণ শুরু হয় হিন্দুদের তরফ থেকেও। শ্যামবাজার-হাতিবাগান অঞ্চলে মুসলমানদের লেপ-তোশকের দোকানগুলো একটা একটা করে লুঠ হয়। কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীটের মোড়ে ডালিয়া স্টোর্সে মুসলমানরা আগুন লাগালে উলটো দিকের ফুটে এক পাঞ্জাবী মুসলমানের জুতোর দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পুরো জুতোর বাজারটাই লুঠ হয়। শোভাবাজারে মুসলমানের দোকান যথেচ্ছ লুঠপাট করে হিন্দু যুবকরা; সাইকেল পর্যন্ত কাঁধে করে নিয়ে চলে যায়; ভবানীপুরে হিন্দুদের সঙ্গে লুঠপাটে নামে শিখরা।[২]

দোকান লুঠের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, দ্য স্টেট্‌সম্যান এবং স্বাধীনতা পত্রিকার অফিসে হামলা হয়। আক্রান্ত হয় দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির অফিসও।

উত্তর আর মধ্য কলকাতায় যখন আগুন জ্বলছে, দক্ষিণ কলকাতা তখনও তুলনায় শান্ত। গঙ্গায় বান এসেছিল সেদিন; ভবানীপুরের আদিগঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান যুবকরা একসঙ্গে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন; তাদের জানা ছিল না যে, উত্তর কলকাতায় তখন দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে; দুপুরের আগে কোন খবর আসেনি। টালিগঞ্জে বিকেলের দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল লক্ষ্য করেছিলেন : 'ক্রমাগত গুজব রটছে। চারিদিকে দারুণ উত্তেজনা।'[৩] গুজব নানা রকম রটছিল; যেমন হিন্দু মেয়েদের স্তন কেটে দেওয়া হচ্ছে; শিশুদের মুণ্ড নিয়ে গুণ্ডারা মালা করে পরেছে।[৪] শোভাবাজার অঞ্চলে দাঙ্গা শুরু হয় এই গুজব থেকে যে, শিয়ালদহে ভিক্টোরিয়া কলেজের মেয়েদের ওপর মুসলমানরা অত্যাচার করেছে। এরকম একটা পরিকল্পনা রাজাবাজারের গুণ্ডাদের সত্যিই ছিল; সেটা ঠেকিয়ে দেন ট্রাম শ্রমিকরা; কিন্তু গুজব ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে।[৫]

দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে দাঙ্গা শুরু হয় বিকেলের দিকে। মিছিল ফেরত জনতা দোকানপাটের ওপর হামলা চালালে জগুবাবুর বাজারের ওপর থেকে ঢিল ছোঁড়া হয়। এরপর বাজারের পশ্চিম দিকে দেবেন্দ্র ঘোষ রোডে একটি মসজিদের সামনে হিন্দু যুবকরা লাঠি নিয়ে মুসলমানদের বিদ্রূপ করে, ভয় দেখায়। উত্তেজনা তখন এমন একটা

১। 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৫৩; মৌখিক সূত্র : অশোক ঘোষ; এ. কে. মইদুল ইসলাম

২। মৌখিক সূত্র : নিত্যরঞ্জন সেন, শ্যামবাজার; মন্মথনাথ দত্ত, পাটোয়ারবাগান; ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শোভাবাজার; গুণেন রায়, ভবানীপুর

৩। 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', সম্পাদনা যুগান্তর চক্রবর্তী, পৃ. ১৬

৪। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, 'সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি', পৃ. ৪৮

৫। সব রটনাগুলোই গুজব কি-না বলা কঠিন। মেয়েদের স্তন কেটে নেওয়ার কথা লিওনার্ড মোশলে উল্লেখ করেছেন; নবেন্দু ঘোষের 'ফিয়ার্স লেন' উপন্যাসেও এ-রকম একটি ঘটনার বিবরণ আছে।

স্তরে চলে গেছে যে, ওই সামান্য উসকানিতেই মুসলমানদের কয়েকজন ছোরা বের করে আনে মসজিদের ভেতর থেকে; কামাল নামে একজন বন্দুক ছোঁড়ে; আর তারপরই শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, মদন পাল লেন, শশিশেখর বসু স্ট্রীট, গোবিন্দ বোস লেনের মুসলমান বস্তিগুলি একে একে আক্রান্ত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কুদরত-ই খুদার বাড়ি এবং ল্যাবরেটরি তছনছ করে দেয় গুণ্ডারা। কামালের দাদা ড. জামাল হিন্দু মহাসভা নেতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন পরের দিন তিনি বেরোনো মাত্রই নৃশংসভাবে তাঁকে পিটিয়ে মারা হয় রাস্তার ওপর হত্যা করা হয় ডা. আমেদ নামে এক দন্ত চিকিৎসককেও।[১]

খিদিরপুর অঞ্চলের কিছু যুবক বালিগঞ্জের লেকে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল; হেঁটে ফেরার পথে তারা ভবানীপুরে দাঙ্গার কথা শোনে এবং সেই উত্তেজনা নিজেদের অঞ্চলে বয়ে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে মিছিল ফেরত লোকেরা হিন্দুর দোকানপাটের ওপর হামলা শুরু করে, এক মুদি দোকানদারকে ছুরি মারে, 'পাঠক বাড়ি' বলে পরিচিত একটি হিন্দু বাড়ির ওপর বোমা ফেলে। সন্ধ্যার পর হাতে মশাল নিয়ে 'নারা-এ তকদীর' আর 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিয়ে আরও বড় এক জনতা মনসাতলা-পদ্মপুকুর অঞ্চলে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু করে দেয়। এই সময় জনৈক শিশিরবাবু তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে গুলি ছোঁড়েন। জনতা সাময়িকভাবে পিছু হটে পালিয়ে যায়; কিন্তু বোঝা যায়, অচিরেই আবার আক্রমণ হবে। ফলে হিন্দু যুবকরা সেইদিন রাত থেকেই তৈরি হতে থাকে। টেরিটোরিয়াল আর্মি-তে কাজ করতেন এ রকম কিছু ব্যক্তি বন্দুক জোগান দেন। বোমা বাধার কাজ শুরু হয়। বোমা-লাঠি-বন্দুক নিয়ে হিন্দুরা প্রতিরোধবাহিনী গঠন করে ফেলে।[২]

এন্টালি অঞ্চলে দাঙ্গা শুরু হয় বিকেলের দিকে। লাঠিসোটা নিয়ে জনতা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালায়। দোকানপাটে আগুন লাগানো হয়। একটি হিন্দু বাড়ির ছাদ থেকে গুলি ছোঁড়া হলে জনতা আরও উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বাড়িঘরের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। হিন্দু যুবকরা দল বেঁধে সারারাত ধরে পাড়া পাহারা দেয় আর 'আল্লা হো আকবর'-এর উত্তরে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিতে থাকে।[৩]

তালতলা অঞ্চলে মিছিল ফেরত জনতা হিন্দু বাড়ির ওপর আক্রমণ শুরু করলে, তাদের প্রতিরোধ করেন কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহার এবং স্থানীয় কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী; শ্রীনাহার নিজে লাঠি হাতে জনতার সামনে দাঁড়ান। এরপর স্থানীয় হিন্দু যুবকদের নিয়ে তিনি গঠন করেন সশস্ত্র প্রতিরোধ-বাহিনী। তাঁকে সাহায্য করেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ইন্দুভূষণ বিদ এবং দেবেন দে। গোপাল মুখোপাধ্যায় এবং রাম চট্টোপাধ্যায় এই বাহিনীর সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।[৪]

দাঙ্গা এইভাবে একটা অঞ্চল থেকে আর একটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রাত ৮-২০

১। মৌখিক সূত্র : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রয়াত); গুণেন রায়; মৃত্যুঞ্জয় দে

২। মৌখিক সূত্র : বিজন মিত্র, বিশ্বনাথ সাহা, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়; ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর

৩। মৌখিক সূত্র : বিরাজমোহন ঘোষ, এন্টালি

৪। বিজয় সিং নাহারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১০.৩.৯২; গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৩.৭.৯২

গভর্নর বারোজ যে রিপোর্ট লেখেন, তাতে বলা হয়েছিল, সকাল ৭টা থেকে দাঙ্গা শুরু হয়েছে এবং সারাদিন ধরেই চলছে : Communal trouble started as early as at 7 a.m. in Manicktala in north-east Calcutta and has continued and spread throughout the day. Situation upto 6 p.m. is that there have been numerous and widespread communal clashes in Calcutta।[১] মৃতের সংখ্যা প্রথম দিনেই ১০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার হিসাবে ওই সংখ্যা ছিল ১৬১।

দুপুর তিনটে থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত অবস্থা সবচেয়ে খারাপ ছিল। এরপর তুমুল বৃষ্টি শুরু হওয়ায় এবং রাত ৯টায় কারফিউ জারী হওয়ায় তাণ্ডবে সাময়িক ভাটা পড়ে তবে তা কেবল ওই রাতের জন্যেই। পরের দিন থেকে দাঙ্গা আরও বীভৎস রূপ নেয় এক অমানুষিক জিঘাংসায় প্রমত্ত মানুষ পরস্পরকে আক্রমণ করতে শুরু করে। প্রথম দিনে লুঠপাটই বেশি হয়েছিল; ব্যাপক খুনোখুনি শুরু হয়ে যায় শনিবার ১৭ অগাস্ট থেকে : Mass butchery started with the early dawn of Saturday।[২] মৃত্যুর সংখ্যা ওইদিন ৩০০-র কাছাকাছি ছিল। 'দ্য স্টেট্‌সম্যানের'র হিসাবে ওই সংখ্যা ছিল ২৭০।

আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ দুই তরফেই ছিল; আক্রান্তদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। প্রথম দিনের খতিয়ান :

হাসপাতাল	ভর্তির সংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
মেডিক্যাল কলেজ	৪৩৫	১৭৬	২০৭	৫২
ক্যাম্পবেল				
কারমাইকেল	১৩২	৬৭	৬৫	—
(দুপুর ১২টা পর্যন্ত হিসাবে)	১৬	১১	৫	—
মোট	৫৮৩	২৫৪	২৭৭	৫২

সূত্র : 'মডার্ন রিভিউ', সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

ইতরতার অভিযান

দাঙ্গার পূর্বাভাস, আমরা জেনেছি, নানাভাবেই পাওয়া গিয়েছিল এবং দু পক্ষই ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গা যে একটা ব্যাপক গণহত্যার রূপ নেবে, এটা বোধহয় আগে থাকতে বোঝা যায়নি। প্রথম দিনের ঘটনার পর দুই পক্ষই তাই আরও

১। N Mansergh, *op cit*, p 240

২। *Modern Review*, September 1946

বড় আকারে সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে থাকে। লাঠি-ছোরার সঙ্গে বন্দুক-স্টেনগান এসে যায়। সারারাত ধরে পাড়ায় বোমা বাঁধার কাজ চলতে থাকে। বাড়ির নারী-শিশুদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়; যুবকদের নিয়ে গঠন করা হয় সশস্ত্র বাহিনী। দুই সম্প্রদায়ই 'আত্মরক্ষা করছি এই বিশ্বাসে নির্মমভাবে পরস্পরকে সংহারের চেষ্টায় প্রমত্ত হয়ে ওঠে।' হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণ আরও তীব্র হয় দ্বিতীয় দিনে। মডার্ন রিভিউ-এর ভাষায়, আক্রমণকারীরাই ওই দিন আক্রান্ত হয়ে পড়ে; হিন্দুরা দল বেঁধে মুসলমান মহল্লায় হানা দেয়।[১]

শোভাবাজারে হিন্দু যুবকরা মুসলমান বস্তির ভেতর থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে এনে তাই দিয়েই বস্তির মুসলমানদের আক্রমণ করে। নারী-শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয় না। এন্টালিতে আক্রান্ত হয় মুসলমান অধ্যুষিত গ্যাঁজাবাগান এবং মতিঝিল বস্তি। আমহার্স্ট স্ট্রীটে বিখ্যাত গণিত শিক্ষক যাদব চক্রবর্তীর পুত্র ড. এস. চক্রবর্তীর পরিবারের ওপর হামলা হয়—নারীদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে গুণ্ডারা। বাগবাজারে এক মাংসওয়ালাকে হত্যা করে পাড়ার চেনা ছেলেরা। শ্যামবাজারে ফড়িয়াপুকুরের উল্টো দিকে একটি মুসলমান বস্তিতে আগুন লাগানো হয়, লুঠ হয় প্রচুর মুরগি। স্বতন্ত্র নেতা নওশর আলী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সামিল হননি বলে মুসলমান গুণ্ডারাই তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে। কলেজ স্ট্রীটে রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট অঞ্চলে কয়েকজন মুসলমান রাজমিস্ত্রিকে পিটিয়ে মারে পাড়ার কয়েকজন হিন্দু যুবক। বউবাজারের মোড়ে বল্লমে গিঁথে মারা কয়েকটি মুসলমানের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। গঙ্গায় স্টিমলঞ্চের সারেংরা ডুবিয়ে মারে বহু মাঝিমাল্লাকে। মেটিয়াবুরুজে বিহারী আর ওড়িয়া মজুরদের নৃশংসভাবে হত্যা করে মুসলমান গুণ্ডারা। মধ্য কলকাতার সাগর দত্ত লেনে নিমাইচাঁদ দত্ত, নন্দলাল দত্ত, আশুতোষ মল্লিক, বিহারী পাইন প্রমুখের পরিবার আক্রান্ত হয়। মোমিনপুরে জনৈক পান্না চ্যাটার্জীর পরিবারের প্রায় সব পুরুষ সদস্যদেরই হত্যা করা হয়, একজনকে পরে বাঁথরুম থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।[২]

১৭ অগাস্ট অমৃতবাজার পত্রিকার শিরোনাম ছিল : Calcutta Under Mob Rule. Orgy of Looting Rioting Stabbing and Incendiarism.

১৮ তারিখে দ্য স্টেট্‌সম্যানে লেখা হয় : The sum of tragedy known at the time of writing is over 270 killed, more than 1600 injured, about 900 buildings on fire.

২০ তারিখে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড লেখে : Three days of widespread loot, incendiarism and murder on a scale unprecedented in the history of Calcutta.

১। 'শনিবারের চিঠি', ভাদ্র ১৩৫৩; *Modern Review*, September 1946

২। *The Indian Annual Register*, Vol. II, 1946, pp 182, 184-85,

মৌখিক সূত্র : বিজন মিত্র, বিরাজমোহন ঘোষ, ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, নিমাইচাঁদ দত্ত

১৮ অগাস্টই মৃতের সংখ্যা দু-হাজারে চলে গিয়েছিল। ২৩ অগাস্ট স্টেট্‌সম্যান হিসেব দেয় : মৃত ৪,০০০;আহত ১১,০০০। ২৮ অগাস্ট-এর সরকারি নোটে বলা হয় মৃত ৪,৪০০; আহত ১৬,০০০; গৃহচ্যুত ১০,০০০।

২০ অগাস্টের স্টেট্‌সম্যান থেকে জানা যায়, তখনও রাস্তায় গলিত মৃতদেহ পড়ে আছে। মড়া সরানোর জন্যে সরকার 'কর্পস রিমুভাল কমিটি' গঠন করেছে। নালা-নর্দমা থেকে তখনও মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে। ২৬ অগাস্ট পর্যন্ত হিসাবে কলকাতা-হাওড়ার রাস্তা থেকে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল ৩,৪৬৮টি।[১]

কলকাতার রাস্তায় সার-সার মৃতদেহ আর তার ওপর ঝুঁকে আছে কাক-শকুনের দল, সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই ছবি আমরা অনেকেই দেখেছি। ট্রাকে বা লরিতে করে মড়ার গাদা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—সেদিনের কলকাতার অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছেন সেই দৃশ্য। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানাচ্ছেন, ১৮ তারিখে তাঁর দিদির মৃত্যু হয়;উত্তর কলকাতায় কাশী মিত্র ঘাটে দিদির মৃতদেহ দাহ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পান, লরিতে করে মড়ার গাদা নিয়ে এসে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে।[২] বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটে এখন যেখানে বিশ্বভারতী আর মনীষার দোকান, সেই ফুটপাথটা মড়ায় বোঝাই হয়ে আছে, এই দৃশ্য দেখেছেন আর একজন। ভবানীপুরে এক মুসলমান যুবক একটা জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে পুরো একদিন লুকিয়ে বসেছিল; খবর পেয়ে তাকে টেনে বের করে এনে মারা হয়। বাগমারি কবরখানায় গিয়ে বীরেন রায় দেখতে পান, মৃতদেহ স্তূপ করে রাখা হয়েছে—জায়গার অভাবে গোর দেওয়া যাচ্ছে না।[৩] অকল্পনীয় সেই নিষ্ঠুরতার কথা আজও ভুলতে পারেন না প্রত্যক্ষদর্শীরা।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা কলকাতার প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে অপরাধী করে দিয়ে গেছে।

মদত ও চক্রান্ত

দাঙ্গার পিছনে বাঙলার মুসলিম লীগ সরকারের প্রত্যক্ষ মদত যে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সরকার থেকে দাঙ্গাকারীদের লরি, পেট্রল, কেরোসিন জোগান দেওয়া হয়েছিল। ১৬ অগাস্ট দিনের অনেকটা সময় সোহরাবর্দি নিজে লালবাজার পুলিস কনট্রোল রুমে বসে থাকেন এবং নির্বিচার হত্যা-লুণ্ঠন-গৃহদাহ সত্ত্বেও পুলিস কোন ব্যবস্থা নেয় না। মিলিটারি নামানো হয় ১৭ তারিখ রাতে; ততক্ষণে কলকাতা রণক্ষেত্র হয়ে গেছে। গভর্নরের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি সোহরাবর্দিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজক; কিন্তু তা সত্ত্বেও সোহরাবর্দি কোন ব্যবস্থা নেননি : The atmosphere was admittedly explosive and we realised—and I impressed it on my CM and his colleagues—that the League

১। *Calcutta Municipal Gazette*, Aug. 24, 1946

২। মৌখিক সূত্র : এস. চন্দ, শ্যামবাজার

৩। মৌখিক সূত্র : ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলেজ স্ট্রীট; গুণেন রায়, ভবানীপুর; বীরেন রায়, শ্রমিক নেতা

were playing with fire।[১] সোহরাবর্দির ময়দান বক্তৃতা বরং প্রত্যক্ষ প্ররোচনার কাজ করে এবং তিনি নিজে কমট্রোল রুমে উপস্থিত থাকায় তাঁকে এড়িয়ে নির্দেশ দেওয়া পুলিস কমিশনারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি প্রকাশিত সোহরাবর্দির এক টি জীবনীগ্রন্থে[২] প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে যে, এই দাঙ্গায় তাঁর কোন হাত ছিল না; বরং তিনি নাকি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দাঙ্গা দমনের চেষ্টা করেন : worked like a tiger to quell the riots; কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য মোটেই এ-কথা সমর্থন করে না।

গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মিছিলকারীদের নিয়ে যাবার জন্য করপোরেশনের গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। ধৃত গুণ্ডাদের ছেড়ে দেবার জন্যে সোহরাবর্দি নিজে তৎপর হন। ময়দানের সভায় তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পুলিসকে নির্দেশ দেওয়া আছে, তারা হস্তক্ষেপ করবে না। লালবাজারে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফোন আসা সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি; অন্যদিকে হাঙ্গামা হতে পারে ধরে নিয়ে মুসলমানদের জন্যে অ্যাম্বুলেন্স মজুত রাখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে করে মিছিলকারীদের জন্যে খাবার, অন্যান্য জিনিসপত্র, এমন কি ছোরাছুরি-পেট্রল-কেরোসিনও নিয়ে যাওয়া হয়।[৩] বাঙলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের একটি গোপন নোটেও বলা হয়েছিল : the police 'did not interfere when crime was being committed in their presence .' পুলিস লুঠপাটে যোগ দিয়েছিল, এমন অভিযোগও ওই নোটে পাওয়া যায়।[৪]

দাঙ্গার জন্যে লীগ সরকারকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেন মৌলনা আজাদ।[৫] পুলিসের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার সমালোচনা করেন ফজলুল হকও। আইন পরিষদে বিতর্কের সময় হক বলেন, কোথায় কখন গোলমাল হবে পুলিস যদি বুঝতে পেরে না থাকে, তাহলে তাদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে কেন?[৬] আরও তীক্ষ্ণ শ্লেষময় মন্তব্য করেন ছাত্রনেতা আনিসুজ্জামান : 'আমরা দেখিয়াছি ময়দানের সভায় যাইবার জন্য মিছিলকারী ও লীগওয়ালারা ছোরা ও লাঠিসহ সশস্ত্র হইয়া অবলীলাক্রমে রাস্তায় উভয় পার্শ্বস্থ হিন্দুর দোকানসমূহ লুণ্ঠন করিতে করিতে যাইতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি, সশস্ত্র পুলিস ইহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে আর মনের আনন্দে হাসিয়াছে।' আনিসুজ্জামানের কথায়, 'এ কথা প্রত্যেক নিরপেক্ষ সজ্জন ব্যক্তি অকপটে স্বীকার করিবেন যে দাঙ্গার জন্য মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দই একমাত্র দায়ী।[৭]

লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, লীগ সরকার হিন্দুদের জীবন

১। Mansergh, *op cit*, pp 294 -95

২। Shaista Suhrawardy Ikrmaullah, *Huseyn Shaheed Suhrawardy,* pp 56-57

৩। Quoted in Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal*, pp 177-79

৪। *Home (Pol) Top Secret File*, No. 390/46

৫। Abul Kalam Azad in *The Statesman*, Aug 20

৬। *Modern Review*, Oct 1946

৭। 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৫৩

ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়নি।[২] কলকাতার 'দি স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকা লেখে, এই দাঙ্গা ছিল, মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রদর্শনী: a political demonstration of the Muslim League।[৩]

আইন পরিষদে বিতর্কের সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় অভিযোগ করেছিলেন, লীগ সরকার শহরটাকে দাঙ্গার কদিন গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সোহরাবর্দি তাই শুনে শ্যামাপ্রসাদকেই গুণ্ডা বলেন শ্যামাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দেন—আমি গুণ্ডা হতে পারি; কিন্তু আপনি হলেন গুণ্ডাদের সর্দার : the prince of goondas।[৪] সোহরাবর্দিকে 'গুণ্ডাদের মন্ত্রণাদাতা' বলে চিহ্নিত করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়ও। মণিকুন্তলা সেনের ভাষায় 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জেনারেল' ছিলেন সোহরাবর্দি।[৫]

আইন পরিষদে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সোহরাবর্দি বলেছিলেন, দাঙ্গা করার কোন পরিকল্পনাই লীগের ছিল না। থাকলে এত মুসলমান ঘরবাড়ি অরক্ষিত রেখে মিছিলে যেত না। ইস্পাহানীর বক্তব্য ছিল, দাঙ্গা করার ইচ্ছে থাকলে তাঁরা কলকাতাকে বেছে নিতেন না; কারণ কলকাতায় মুসলমানরা খুবই সংখ্যালঘু।[৬] কতকটা একই রকম যুক্তি দিয়ে আবুল হাশিম লিখেছেন, হাঙ্গামার আশঙ্কা থাকলে কি তিনি তাঁর কিশোর পুত্রকে নিয়ে সভায় যেতেন?[৭]

আবুল হাশিমের হয়ত জানা না থাকতে পারে, কিন্তু ব্যাপক হাঙ্গামার প্রস্তুতি যে নেওয়া হয়েছিল, তার প্রভূত প্রমাণ আমরা পেয়েছি। The Muslims were unarmed and unprepared to meet the situation—হাশিমের এই কথা মোটেই ঠিক নয়। সোহরাবর্দি বা ইস্পাহানীর যুক্তিও দাঁড়ায় না; কারণ প্রথম হাঙ্গামা যে লীগের তরফ থেকেই শুরু হয়েছিল, প্রায় প্রত্যেকটি সূত্রই তাই বলে। লীগ কলকাতাকে বেছে নিয়েছিল হিন্দুদের তার ক্ষমতার বহরটা একবার দেখিয়ে দেবার জন্যে।

কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, লীগের প্ররোচনার জবাবে কংগ্রেসও প্ররোচনাময় প্রচার চালিয়ে পরিস্থিতিটা আরও বিপজ্জনক করে তোলে; উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ১৫ অগাস্ট দেশপ্রিয় পার্কে কংগ্রেসের জনসভার কথা।[৮] কংগ্রেস ওই সভায় ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছিল আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে বলেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপন্থী। এই বক্তব্য খুব আপত্তিকর বলা যায় না। কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার আসল ভূমিকাটা ছিল অন্য জায়গায়। লীগ বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্যে পাড়ায় পাড়ায় হিন্দুরা যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন এই দুই দলই তাদের মদত দেয়। দাঙ্গার সময় ধৃত হিন্দু গুণ্ডাদের ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারেও মহাসভা উদ্যোগী হয়।

২। উদ্ধৃত হয়েছে : 'বঙ্গশ্রী', কার্তিক ১৩৫৩

৩। 'Disgrace Abounding', *The Statesman* (Editorial), Aug. 20, 1946

৪। *Modern Review*, Oct. 1946

৫। অন্নদাশঙ্কর রায়, 'স্বাধীনতার পূর্বাভাস', পৃ. ১৩৮; মণিকুন্তলা সেন, 'সেদিনের কথা', পৃ.১৭৯

৬। *Modern Review*, Oct. 1946, *The Indian Annual Register*, p 189

৭। Abul Hashim, *op cit*, p 116

৮। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পরিচয়', পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৫৩

ব্রিটিশের ভূমিকা

মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারকেও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয় এই দাঙ্গার জন্যে। শরৎ বসু ব্রিটিশ সরকারের আচরণের সমালোচনা করে বলেন, গভর্নর 'অযোগ্য' প্রমাণিত হয়েছেন। এ. আই. টি. ইউ. সি. সভাপতি মৃণালকান্তি বসু গভর্নরকে উদ্দেশ করে বলেন, এই প্রদেশের আপনাকে প্রয়োজন নেই : Province has no use for you।[১] লীগ নেতা আবুল হাশিম অভিযোগ করেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচকরাই' এই দাঙ্গা লাগিয়েছে।[২]

দাঙ্গার জন্য ব্রিটিশকে বিশেষভাবে দায়ী করে কমিউনিস্ট পার্টিও। স্বাধীনতা পত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম হয় : 'দাঙ্গার জন্যে দায়ী ওয়াভেল'। কমিউনিস্টরা এই দাঙ্গাকে প্রধানত ব্রিটিশের চক্রান্ত হিসাবেই দেখতে চান। গঙ্গাধর অধিকারী লিখেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রামের ওপর 'প্রতি আক্রমণ' ছিল এই দাঙ্গা।'[৩]

এটা ঘটনা যে, দাঙ্গা থামাতে ব্রিটিশের কোন সক্রিয় উদ্যোগ ছিল না। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে গভর্নরের কাছে পৌঁছেছিল; কিন্তু ১৭ তারিখ সন্ধ্যার আগে সেনাবাহিনী নামানো হয়নি। এ ব্যাপারে গভর্নর বারোজ-এর কৈফিয়ত, তিনি হস্তক্ষেপ করেননি, কারণ তাহলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মাবে—খুব গ্রহণযোগ্য নয়।[৪] ব্রিটিশই চক্রান্ত করে দাঙ্গা বাধিয়েছিল, এমন স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে নেই কিন্তু ঘটনার আভাস তারা আগেই পেয়েছিল এবং এক ক্রুর কৌশলগত অবস্থান থেকে গোটা পরিস্থিতিটা নজরে রেখে নিজেদের ফায়দা তুলে নিয়েছিল।

আগের অধ্যায়ে একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে আমরা দেখিয়েছি, সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল, তারা হস্তক্ষেপ করবে না। এটাই ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত কৌশল ছিল মনে করা যেতে পারে। জোড়াতালি দিয়ে কংগ্রেস-লীগ মিলিয়ে একটা অন্তর্বর্তী সরকার বসিয়ে তার হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়াটাই তখন ব্রিটিশের লক্ষ্য ছিল; এই উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখেই সে হাঙ্গামায় জড়াতে চায়নি। ইংরেজ পুলিসের ভেতর এ রকম একটা মনোভাব এসে গিয়েছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তর যখন মোটামুটি স্থির হয়েই গেছে, তখন তারা আর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেশি আগ্রহ দেখাবে না।

বাঙলা সরকারের প্রকাশনা বিভাগের ডিরেক্টর পি. এস মাথুরের বিবৃতিতে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থান সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস'-এ (৪র্থ খণ্ড) এই অপ্রকাশিত বিবৃতিটি উদ্ধৃত হয়েছে। মাথুর বলছেন, পুলিস মারদাঙ্গা দেখেও কিছু করেনি; তাদের যুক্তি ছিল, এর আগে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও রসীদ আলী দিবসের আন্দোলনে পুলিসের গুলিচালনা নিয়ে বহু সমালোচনা

১। *Hindusthan Standard*, Aug. 20, 1946, *Amrita Bazar Patrika*, Aug. 20, 1946

২। Abul Hashim, *op cit*, p 117

৩। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৪। Mansergh, *op cit*, p 297

হয়েছে; অতএব তারা আর ঝামেলায় জড়াতে চায় না। লালবাজার কন্ট্রোল রুমে যখন সাহায্যের আবেদন জানিয়ে একের পর এক ফোন আসছে, ইংরেজ পুলিস অফিসাররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, ভারতীয়রা যখন আমাদের চায় না, আমরা কেন জড়াব! পুলিস কমিশনার হার্ডউইক নিজেও এরকম কথা বলেন, তাঁর সঙ্গে তখন ছিলেন এক হিন্দু পুলিস অফিসারও (স্বাধীন ভারতে তিনি আই. জি. হন); জনসাধারণের দুর্দশায় তাঁরা বেশ মজা পাচ্ছিলেন : chuckled over the plight of the people।[১] মাথুর আরও বলছেন, সোহরাবর্দি প্রথম দিনেই মিলিটারি নামাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গভর্নর বারোজ তাঁকে নিরস্ত করেন। পরে রাতের দিকে অবস্থা আরও খারাপ হলে বারোজের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি; রক্তচাপ বেড়েছে, এই অজুহাতে তিনি তখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।

সোহরাবর্দি মিলিটারি নামাতে চেয়েছিলেন, তার কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের খবর তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি নিঃসন্দেহে স্ব-সম্প্রদায়ের স্বার্থেই এই ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু মিলিটারি নামালে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করা যেত; দুই সম্প্রদায়েরই লাভ হত। এটা যে পারা যায়নি, মাথুর তার জন্যে দায়ী করেছেন বারোজকে।

মনুষ্যত্ব

১৬-১৯ অগাস্ট শহর জুড়ে যখন চলছে ইতরতার, অমানুষতার অভিযান, কোন কোন অঞ্চলে তখন অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়ে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। কয়েকটি অঞ্চলে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেই গঠিত হয়েছিল প্রতিরোধ কমিটি। যুবকরা সারারাত পাহারার ব্যবস্থা করেন। ইট-পাথর-লাঠি মজুত রাখা হয় গুণ্ডাদের মোকাবিলা করার জন্যে।[২]

নিজের জীবন দিয়ে দাঙ্গার বিরোধিতা করেছেন এমন মানুষও সেদিন ছিলেন কলকাতায়। অনামা সেই শহিদদের কথা ইতিহাসে লেখা হয়নি। একটি কাহিনী আমরা জানতে পেরেছি : আলিপুর কোর্টের অতিরিক্ত জেলা জজ মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গুণ্ডাদের হাত থেকে একটি ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে ছুরিকাহত হন ১৭ অগাস্ট। ২৫ তারিখে মেডিক্যাল কলেজে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে মণীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমার জীবনের বিনিময়ে প্রিয় দেশবাসীর কাছে আমার একটাই প্রার্থনা : এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই যেন শেষ দাঙ্গা হয়।[৩]

মডার্ন রিভিউ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হিন্দু পাড়ায় আশ্রিত কয়েকটি মুসলমান পরিবারকে সেনাবাহিনী নিরাপদ জায়গায় নিয়ে

১। একই রকম বিবরণ দিয়েছেন মেজর জয়পাল সিংও। দাঙ্গা দেখে ব্রিটিশ সৈন্যরা মজা পাচ্ছিল আর বলছিল : 'বেজম্মাদের এরকমই হোক। এভাবে তারা স্বরাজ ভোগ করুক।' (স্বাধীনতার ডাকে ব্রিটিশ আর্মি ত্যাগের ঝুঁকি নিলাম, পৃ. ৬৯)

২। *Hindusthan Standard*, Aug 20; *The Statesman*, Aug 23,1946
মৌখিক সূত্র : বিজন মিত্র, মন্মথনাথ দত্ত, ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় দে

৩। *Calcutta Municipal Gazette*, 21-28 Sept. 1946

যাচ্ছে। সম্পাদক লিখছেন, মুসলমান পাড়ায় হিন্দুদের আশ্রয়দানের কাহিনীও আছে—ছবি পাওয়া যায়নি বলে ছাপা গেল না।

ছবি না পাওয়া গেলেও কাহিনী অনেক আছে। দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাধারণ মানুষ চিঠি লিখে জানান, কীভাবে একটি সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়কে রক্ষা করেছেন। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের (২১-২৮ সেপ্টেম্বর) সংকলন থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে হায়দার আলীর পরিবারকে বাঁচান প্রতিবেশী হিন্দুরা। লিন্টন স্ট্রীটে মুসলমানরা আশ্রয় দেন হিন্দুদের। আমীর আলী অ্যাভেনিউ-এ টি. এন. ঘোষকে বাঁচান প্রতিবেশী মুসলমানরা। সার্কাস অ্যাভেনিউতে কংগ্রেস নেতা জে. সি. গুপ্তর বাড়ির ওপর আক্রমণ হলে বাধা দেন স্থানীয় মুসলমানরা। এন্টালিতে রবীন্দ্রনাথের দিদি ৯৩ বছরের বৃদ্ধা বর্ণকুমারীর পরিবারকে রক্ষা করেন লীগ কাউন্সিলর মহম্মদ ইউসুফ। গোলাম ওস্তাগর লেনে প্রায় ৩০টি মুসলমান পরিবারকে বাঁচান এক হিন্দু ব্যবসায়ী। বেনিয়াপুকুরের ৪৩ জন হিন্দু একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে জানান, প্রতিবেশী মুসলমানরা তাঁদের যেভাবে সাহায্য করেছেন তাতে তাঁরা মুসলমানদের পাকিস্তান দাবির প্রতি সহানুভূতি না জানিয়ে পারছেন না। বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছিল 'দি স্টার অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায়, ২৩ অগাস্ট। জনৈক আবদুল খালেখ চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে হিন্দুরা মুসলমানদের বাঁচিয়েছে এবং মসজিদের ওপর আক্রমণ হতে দেয়নি।

বউবাজার অঞ্চলে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিবেশী এক মুসলমান পরিবারকে বাঁচান বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী সন্ধ্যারানী। পরিবারটি একই বাড়ির চারতলার বাসিন্দা ছিল। ১৮ অগাস্ট তাঁরা সন্ধ্যারানীর কাছে আশ্রয় চান; ইতিমধ্যে একদল হিন্দু যুবক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে দাবি করে, পরিবারটিকে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সন্ধ্যারানী গুণ্ডাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেন, আমাকে না মেরে তোমরা ওদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। এতেও তারা নিরস্ত হচ্ছে না দেখে কৌশল করে তিনি বলেন, আমরা ওদের বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছি—তারপর তোমরা যা ইচ্ছে কোরো। গুণ্ডারা রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করতে থাকে। সন্ধ্যারানীর স্বামী আলোক চট্টোপাধ্যায় পরিবারটিকে বলেন, রাস্তায় বেরিয়েই তাঁরা যেন ছুটে হসপিটাল রোডের মুসলমান এলাকায় ঢুকে পড়েন। পরিবারটিকে সত্যি সত্যিই এইভাবে বাঁচানো সম্ভব হয়। গুণ্ডারা ধাওয়া করে ঢিল ছুঁড়েও কিছু করতে পারেনি। ইতিমধ্যে একটি মিলিটারির গাড়ি এসে পড়ায় তারা পালিয়ে যায়।[১]

এরকম টুকরো টুকরো কাহিনী আরো শোনা যায়। অকল্পনীয় বর্বরতার মাঝখানে অজর মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেই কাহিনীগুলিতে।

এক গুজরাটী ব্যবসায়ী তাঁর বাড়িতে কয়েকজন কমিউনিস্টকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। গুণ্ডারা বার-বার হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও মাথা নত করেননি এই অরাজনৈতিক মানুষটি।

১। সন্ধ্যারানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৮.২.৯২; আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'অতীত দিনের স্মৃতি'-তে (পৃ. ২৯৭-৯৮) বলা আছে, ওই পরিবারটির কর্তা ছিলেন 'আজাদ' পত্রিকার সহকারী ম্যানেজার আবদুল হাকিম।

পার্ক সার্কাসে কমিউনিস্ট নেতা ডা. গনি কয়েকটি ধোবি পরিবারকে আশ্রয় দেন। এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও কয়েকটি মুসলমান পরিবার হিন্দুদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।[২]

ভবানীপুরে এক ব্রাহ্মণ একটি মুসলমান ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। গুণ্ডারা ছেলেটিকে চাইলে তিনি বলেন, তাকে হত্যা না করে ছেলেটির গায়ে হাত দেওয়া যাবে না; আর তাঁকে হত্যা করলে ব্রহ্মশাপ লাগবে। গুণ্ডারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।[৩]

'সাম্প্রদায়িক' বলে চিহ্নিত দলগুলির মধ্যেও এমন ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। পার্ক সার্কাসে লীগ নেতা লাল মিঞা কয়েকটি হিন্দু পরিবারকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেন। শ্যামবাজারে হিন্দু মহাসভা নেতা দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন কয়েকজন মুসলমানকে।[৪] স্বনামধন্য কয়েকজন ব্যক্তি—অতুলচন্দ্র গুপ্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, স্নেহাংশু আচার্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিবেশীদের রক্ষা করেছিলেন। একটি ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন কবি বিষ্ণু দে।[৫] গুপ্ত প্রেসের মালিক অজয় বসু কয়েকটি মুসলমান পরিবারকে বাঁচান। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বীরেন রায়কে রক্ষা করেন কলাবাগানের দুই ফলওয়ালা—ইয়াকুব আর নিসার। চেতলায় কয়েকজন মুসলমান মাঝিকে বাঁচিয়েছিলেন মণি সান্যাল এর জন্যে হিন্দু গুণ্ডারাই তাঁকে আক্রমণ করে। শ্যামবাজারে এক মুসলমানকে বাঁচান চিন্মোহন সেহানবীশ। অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞতা : সুকিয়া স্ট্রীট দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। পরিচিত মুসলমানরা বারণ করে দেন, আপাতত কয়েকদিন ওই রাস্তা দিয়ে না যেতে।[১]

গরচা বস্তিতে গুরুদয়াল সিংয়ের নেতৃত্বে হিন্দু-শিখরা মিলে প্রায় ২০০ মুসলমানকে রক্ষা করেন। অ্যান্টনিবাগানে কিছু হিন্দুকে বাঁচান প্রতিবেশী মুসলমানরা। মেটিয়াবুরুজে আলী হাসান নামে এক শ্রমিক ও আরো কয়েকজন মিলে প্রায় ৫০ জন হিন্দুকে আশ্রয় দেন। পাটোয়ারবাগানে জনৈক শ্রীভট্টাচার্য ও ডা. রাউথকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন স্থানীয় মুসলমানরা। উল্টোডাঙ্গায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন এক মুসলমান নারীকে। মির্জাপুরে 'টাওয়ার লজ' নামে একটি বোর্ডিং হাউস আক্রান্ত হলে উদ্যত শাবলের সামনে বুক পেতে দিয়ে আক্রমণকারীদের বাধা দেন সালে আহমেদ।[২]

২। মণিকুন্তলা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-৭৪

৩। শান্তিময় রায়, প্রাগুক্ত

৪। শান্তিময় রায়, প্রাগুক্ত; মৌখিক সূত্র : এ. ডবলিউ. মাহমুদ, খালেদ চৌধুরী, অশোক ঘোষ

৫। কবিপত্নী প্রণতি দে লিখেছেন, তাঁরা তখন থাকতেন কালীঘাটে সতীশ মুখার্জী রোডে। ১৬ অগাস্ট সকালে পাড়ার কয়েকজন মুসলমান ছররা বন্দুক ছুঁড়লে স্থানীয় গোয়ালারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং অঞ্চলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরপর, 'খোদা-ই-খিদমগব' গোষ্ঠীব তিনজনের একটি দল শান্তি অভিযানে বের হলে, তাদের ওপর আক্রমণ হয়; দুজন নিহত হন। আহত তৃতীয় জনকে স্থানীয় কংগ্রেস অফিসে পৌঁছে দিতে গিয়ে গোয়ালাদের লাঠিতে আহত হন বিষ্ণু দে। ['একা এবং কয়েকজন' (পত্রিকা) বিষ্ণু দে সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৬]

১। মৌখিক সূত্র : বীরেন রায়, জ্যোতি ভট্টাচার্য, মণি সান্যাল, অজিত বসু

২। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬, ১৯৮, ২০৩; মৌখিক সূত্র : ইসা মিয়া, পাটোয়ারবাগান

দাঙ্গার বিরুদ্ধে অসামান্য প্রতিরোধ রচনা করেন ট্রাম শ্রমিকরা। দক্ষিণ কলকাতায় ডোভার লেনে ট্রাম শ্রমিকদের মেসে কয়েকজন মুসলমান শ্রমিক আটকে পড়েছিলেন। হিন্দু শ্রমিকরা তাঁদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেন। শিয়ালদহে ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রীরা আটকে পড়েছে এবং স্থানীয় মুসলমান গুণ্ডারা তাদের আক্রমণ করার চক্রান্ত করেছে জানতে পেরে ট্রাম শ্রমিক দোরবি, রেজ্জাক, ইসাক এবং আরো কয়েকজন কলেজের গেটে গুণ্ডাদের বাধা দেন। পরে পুলিসের সাহায্যে ছাত্রীদের বাড়ি পাঠানো হয়। বেলগাছিয়ায় ট্রাম শ্রমিকরা মুসলমান বস্তির ওপর আক্রমণ ঠেকিয়ে দেন। ১৯ তারিখে—তখনও দাঙ্গা চলছে—ট্রাম লাইন থেকে মৃতদেহ সরিয়ে ট্রাম চালিয়ে শহরের জীবনে স্বাভাবিকতা আনার চেষ্টা করেন শ্রমিকরা। কোম্পানি এর জন্যে তাদের 'ওভারটাইম' মজুরি দিতে চাইলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন শ্রমিকরা। ট্রামের শ্রমিক ইউনিয়ন তখন ছিল বামপন্থীদের হাতে। দাঙ্গার কয়েকদিন আগে থাকতে ইউনিয়ন শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা-বিরোধী প্রচার চালিয়েছিল।[১]

রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা দাঙ্গার দিনগুলিতে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকেই দাঙ্গাবাজদের ঠেকানোর চেষ্টা করেন। কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়ির ওপর আক্রমণ হলে রুখে দেন লীগ নেতা সামসুদ্দীন আহমদ। কমিউনিস্টদের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, আবদুল মোমিন, মনসুর হাবিবুল্লাহ যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে পার্টি কর্মীদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেন। পার্টি অফিসের মধ্যেই আক্রান্ত হন সমর মুখোপাধ্যায়, হিন্দু গুণ্ডাদের আক্রমণে তাঁর মাথা ফেটে যায়। লুঠপাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহারও। স্থানীয় মসজিদের ইমামকে নিয়ে দাঙ্গার মধ্যেই একটি শান্তি মিছিল বের করেন শ্রীনাহার। গান্ধীবাদী কর্মী পবিত্রকুমার দে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেনিয়াপুকুর-মল্লিকবাজার অঞ্চলে শান্তি অভিযান চালান ইয়াকুব আর গুপী সাধুখাঁ নামে দুই গুণ্ডাকে তিনি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন।[২]

শান্তি মিছিল এবং শান্তি আবেদন প্রচারে বিশেষ উদ্যোগ নেন বামপন্থীরা—কমিউনিস্ট পার্টি, আর. এস. পি., ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের কয়েকজন নেতাও। ১৭ অগাস্ট 'ভ্রাতৃহত্যা অবিলম্বে বন্ধ করার' আবেদন জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্র ঘোষ, আবুল হাশিম, শহীদ সোহরাবর্দি, ভূপেশ গুপ্ত, ভবানী সেন, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ। ১৮ তারিখে শরৎ বসু এবং সোহরাবর্দিকে সামনে রেখে একটি শান্তি মিছিল পথে নামে। নারকেলডাঙায় রেল শ্রমিকদের নিয়ে মিছিল করেন জ্যোতি বসু।[৩] খিদিরপুর অঞ্চলে শান্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জলি কল এবং জুড়ান গাঙ্গুলি।

১। ট্রাম শ্রমিকদের নেতা বীরেন মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'গণদর্পণ', পত্রিকা অগাস্ট ১৯৮৯; গোপাল আচার্য-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; শিশির মিত্র, 'কালান্তর', ৭অগাস্ট,১৯৯২

২। *Amrita Bazar Patrika*, Aug.18 ; মণিকুন্তলা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-৭২;
অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩; অন্যান্য সূত্র : বিজয় সিং নাহার; হিমাংশু সরকার, কালিয়াগঞ্জ

৩। *Amrita Bazar Patrika*, 18-19 Aug. 1946

ওই দিনই কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা'-য় আবেদন জানানো হয় : 'ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই এখনই বন্ধ করুন। ... আসুন আমরা সকলে একত্রে আমাদের সেই পুরানো কলিকাতা, হিন্দু-মুসলমানের কলিকাতা, বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কলিকাতা ফিরাইয়া আনি।' এ. আই. টি. ইউ. সি.-র পক্ষ থেকে শান্তির আবেদন জানান মৃণালকান্তি বসু। ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ডের একটি প্রচারপত্রে বলা হয় : 'গভর্নমেন্টের ভরসা ছাড়। পাড়ায় আপন গভর্নমেন্ট গড়া ছাড়া রক্ষা নাই।' বাটা মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়। কমিউনিস্ট যুব সংগঠন শান্তি মিছিল বের করে 'চলো হে শান্তি সেনানী গান' দিয়ে। সে মিছিলে যোগ দেন এক মসজিদের ইমামও।[১]

হিন্দুদের তরফে বহুল প্রচারিত একটি অভিযোগ হল, 'কোন মুসলিম লীগ নেতা এই দাঙ্গার নিন্দা করেননি। তথ্য হিসাবে এটা ঠিক নয়। জাতীয় স্তরের নেতাদের মধ্যে প্রথম যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হিংসার নিন্দা করেন, তিনি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। ১৭ তারিখেই জিন্নাহ্ বলেছিলেন : I unreservedly condemn the acts of violence and deeply sympathise with those who have suffered।[২] জিন্নাহ্ যেদিন এই বিবৃতি দিয়েছেন, দিল্লির কংগ্রেস নেতাদের মুখ থেকে সেদিন একটি উদ্বেগের কথাও শোনা যায়নি; মুখ খোলেননি এমনকি গান্ধীও।

অমানুষতা

পৈশাচিক সে হত্যাকাণ্ডের বিশদ বিবরণ পাঠকের স্নায়ুকে পীড়িত করবে। কলকাতার প্রবীণদের মনে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার মতো আজও ফিরে ফিরে আসে সেই স্মৃতি। নিজ চোখে যারা দেখেছেন সে হত্যাকাণ্ড, তাদের অনেকেই আজ বলতে চান না সে-সব কথা। বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই; দাঙ্গার উন্মত্ততা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তা বোঝানোর জন্যে দু-একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট হবে।

এক মুসলমানকে মেরে তার ছিন্নমুণ্ড উল্লাসে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে দুই যুবক। 'যবন' হত্যা করেছে বলে তাদের আশীর্বাদ করছে এক ব্রাহ্মণ।[৩] হত্যার পর মৃতের ছিন্নভিন্ন দেহ আর রক্ত নিয়ে পৈশাচিক নৃত্য—অনেকেই দেখেছেন সে দৃশ্য। বাচ্চাদের পা ধরে শূন্যে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে—দেখেছেন ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এক বুড়ো ডিমওলাকে হাড়ের ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে মারছে কয়েকজন মেডিক্যাল ছাত্র—প্রত্যক্ষদর্শী মণিকুন্তলা সেন। এক ফলওলা গুলি করে মেরেছে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীকে—জনতত্ত্ববিদ

১। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮; জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩,৭৫; মৌখিক সূত্র : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অশোক ঘোষ

২। *Amrita Bazar Patrika*, Aug 18, 1946

৩। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

অশোক মিত্র তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন সে কথা।[১] অমানুষতার আর এক ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন পঞ্চানন ঘোষাল 'পুলিশ কাহিনী' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩) : 'সমস্ত পরিবারটিকে ম্যানহোলের মধ্যে পুরে উপরে কর্তা ব্যক্তিটিকে দাঁড় করিয়ে তার গলায় ঢাকনি পরিয়ে গুণ্ডারা নাচছে আর তার গলা একটু একটু করে কাটছে।'

ভবানীপুরে মোহিনীমোহন রোডে একটি লোকের পেট ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়; সে রাস্তায় পড়ে 'জল জল' বলে চিৎকার করে। তারপর নিজেই উঠে টিউবওয়েল পাম্প করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে যায়। দু-পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে লোকে দেখে। চিৎপুরে এক হিন্দু ব্যবসায়ীর শরীরে বাইশটি কোপ মারা হয়—টেনে বের করে দেওয়া হয় বাড়ির নারী আর শিশুদের। বউবাজারে মদন বড়াল লেনে কয়েকটি যুবক এক বৃদ্ধ মুসলমানকে একটা পার্কের মধ্যে ঢোকায় কাটবে বলে। পাড়ার লোকেদের তারা চিৎকার করে জানিয়ে দেয়—জানলা বন্ধ করে দিন। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় মানুষের সাহসিক প্রতিবাদে লোকটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ছবি : এক রিকশাওলা ছুরি খেয়ে তার রিকশার ওপরই পড়ে আছে—ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত বেরোচ্ছে। শ্যামবাজারে প্রমথ মল্লিকের বাড়ির সামনে মড়া জমে আছে, নর্দমা বন্ধ—দেখেছেন অজিত বসু; পাটের গোল গোল রিং তৈরি করে আগুন লাগিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে বস্তির ওপর—নারকেলডাঙায় এ দৃশ্য দেখেছেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছোটভাই মুকুল ভট্টাচার্য।[২] বস্তি জ্বলছে; আকাশ ভয়ানক অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠেছে—অনেকেই এখনও স্মরণ করতে পারেন সে দৃশ্য।

দাঙ্গার রূপ

ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গা সম্পর্কে একটি প্রচলিত মত, গুণ্ডা-দুর্বৃত্তরাই হত্যা-লুণ্ঠনে মেতে উঠেছিল। কিন্তু ঘটনা ঠিক তা ছিল না। গুণ্ডা-দুষ্কৃতীরাই নিঃসন্দেহে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল; সেই উদ্দেশ্যেই তাদের ভাড়া করে নিয়েও আসা হয়েছিল বাইরে থেকে। কিন্তু মধ্যবিত্তের প্রত্যক্ষ ভূমিকাও এই দাঙ্গায় ছিল; দাঙ্গা লেগে যাবার পর তারাও নেমে পড়ে। শনিবারের চিঠি-র ভাষায় : 'আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকদিগকেও হত্যা ও লুণ্ঠনে প্ররোচনা দিতে দেখা গিয়াছিল।'[৩] আবুল মনসুর আহমদের বিবরণও তাই বলে। বালিগঞ্জের এক পাড়ায় মণিকুন্তলা সেন দেখেছিলেন, মধ্যবিত্ত হিন্দু বাড়ির মেয়েরা ছাদ থেকে লাঠি নামিয়ে দিচ্ছে মুসলমানদের

১। মণিকুন্তলা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩; অশোক মিত্র, 'চতুরঙ্গ', পত্রিকা জানুয়ারি ১৯৯০

২। মৌখিক সূত্র : তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, বউবাজার; বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীপুর; ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শোভাবাজার; মুকুল ভট্টাচার্য, বেলেঘাটা; অজিত বসু, শ্যামবাজার

৩। 'শনিবারের চিঠি', ভাদ্র ১৩৫৩

মারা হবে বলে। শ্যামবাজার, খিদিরপুর এবং মধ্য কলকাতার সাগর দত্ত লেনে বেশ কিছু হিন্দু বাড়ির ছাদ থেকে গুলিও ছোঁড়া হয়।[১]

এই দাঙ্গার আর একটা বৈশিষ্ট্য হল, দুই সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষ খুনোখুনিতে একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে কাজে লাগায়। হিন্দুদের পক্ষে তারা ছিল : গোয়ালা, কুলি, জমাদার, রিকশাওয়ালা; মুসলমানদের তরফে সহিস, কোচোয়ান, কসাই, রাজমিস্ত্রি। প্রাণে মরে প্রধানত এই গরিবরাই : 'মুচি, মেথর, মুদ্দোফরাস, দোসাদ, কোচোয়ান, কুলি, গাড়োয়ান, রাজমিস্ত্রি, রিকশাওয়ালা, বিড়িওয়ালী, চাষী, ব্যাপারী, জেলে ও মাঝিরা।'[২]

লঞ্চের মাঝিদের হত্যার কথা আমরা জেনেছি। গড়িয়াহাট বাজারের বহু ব্যাপারী ১৬ অগাস্ট দাঙ্গার কারণে ঘরে ফিরতে পারেনি, তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় ১৭ তারিখে। আবুল মনসুর আহমদ দেখেন, নাপিত, মুচি, মেথরদের ধরে ধরে হত্যা করা হচ্ছে।[৩]

উভয় সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য ছিল পরস্পরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দেওয়া। নারীদের ওপর অত্যাচার, ধর্মস্থানের ওপর আঘাতের ঘটনা কিছু থাকলেও খুনজখম আর লুঠপাটই ছিল হিংস্রতার প্রধান রূপ।

লুঠপাটের প্রধান লক্ষ্য ছিল বড় বড় দোকান আর ব্যবসাকেন্দ্র—জহরলাল-পান্নালাল, কমলালয় স্টোর্স, ডালিয়া স্টোর্স, সি. সি. বিশ্বাসের দোকান, ভারত কলাকেন্দ্র আর ব্রিস্টল হোটেলের মতো জায়গা। লুঠ হয় কম করে পাঁচ-সাত কোটি টাকার জিনিস। তাদের মধ্যে ছিল : সেলাইকল, সাইকেল, ইলেকট্রিক পাখা, পিয়ানো, গিটার, স্যুটকেস-ট্রাঙ্ক, মুক্তোবসানো হার, বাচ্চাদের গাড়ি, মদভর্তি বোতল, সোফা ইত্যাদি।[৪]

ছোট দোকানদার ব্যবসাদাররাও একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আনিসুজ্জামান লিখছেন : 'বিহারী ও পাঞ্জাবী মুসলমানেরা গুণ্ডামী ও লুঠতরাজ করিয়া অনেক কিছু লুঠিয়া সরিয়া পড়িয়াছে আর হিন্দুর মার খাইয়াছে বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমান। ... বিড়ি পান সিগারেটওয়ালার, হোটেলওয়ালার, ছোটখাটো থালাবাসনের দোকানওয়ালার, ছোট কাটা কাপড়ওয়ালার, ছোট ফলওয়ালার যথাসর্বস্ব পরে এক এক করিয়া লুণ্ঠিত হইয়াছে।'[৫]

বোঝা যাচ্ছে, সুপরিকল্পিতভাবেই ভাড়া করা গুণ্ডাদের দিয়ে লীগ আক্রমণ চালিয়েছিল হিন্দু ব্যবসাদারদের ওপর। হিন্দুরা তার পাল্টা দেয় পাড়ার ছোটখাটো মুসলমানের দোকান লুঠ করে। বড় ব্যবসাদাদের ওপর আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় বড়বাজারের মাড়োয়ারি এবং দক্ষিণ কলকাতার শিখরাও ঘুরে দাঁড়ায় এবং হিন্দু-শিখের মিলিত আক্রমণে মুসলমানরা কিছুটা কোণঠাসা হয়ে যায় দ্বিতীয় দিনের পর থেকে।

১। আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩; মণিকুন্তলা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫
মৌখিক সূত্র : এস. চন্দ, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নিমাইচাঁদ দত্ত

২। 'শনিবারের চিঠি', ভাদ্র ১৩৫৩

৩। মণিকুন্তলা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩; আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-৫৪

৪। *Amrita Bazar Patrika*, Oct. 13, 1946

৫। 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৫৩

দাঙ্গার চরিত্রটি ছিল সম্পূর্ণভাবেই সাম্প্রদায়িক—markedly communal। ব্রিটিশের তরফে স্বীকার করা হয়েছিল, ব্রিটিশ বিরোধিতার কোন ছাপ এই দাঙ্গায় ছিল না; একজন ইউরোপীয়র গায়েও আঁচড় লাগেনি।[১]

মুসলিম লীগ এই দাঙ্গাকে ব্যবহার করেছিল তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে; হিন্দুদের সে দেখাতে চেয়েছিল তার ক্ষমতার বহরটা। হিন্দুরা যে সমানভাবে পাল্লা দিতে পেরেছিল, তার কারণ তাদের মনে হয়েছিল, মুসলমানদের কলকাতা ছাড়া করার এই এক সুযোগ। একটানা দশ বছর 'মুসলিম শাসনে বাস করে' কলকাতার হিন্দুরা 'বারুদ হয়ে উঠেছিল'।[২] মুসলমানদের আধিপত্য থেকে বাঙলাকে রক্ষা করতে হবে, এরকম একটা চেতনাও সাধারণ হিন্দুর মনে এসে গিয়েছিল। কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভা সাধারণের এই মনোভাবটাকেই কাজে লাগায় নিজেদের স্বার্থে।

গুণ্ডা-দুর্বৃত্তদের এই দাঙ্গায় যে রকম প্ল্যানমাফিক কাজে লাগানো হয়েছিল তার কোন নজির আগের কোন দাঙ্গায় পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা কেবল গুণ্ডাদের হাতেই ছিল না; 'ভদ্র' মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকরাও দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে এবং বেশ কিছু নাম পরে এই দাঙ্গার সূত্রেই 'বিখ্যাত' হয়ে যায়; যেমন বউবাজারের গোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো। ভবানীপুরে হিন্দু যুবকদের ওপর গুলি ছোঁড়েন কামাল নামে যে ব্যক্তিটি, তার দাদা দাঙ্গায় নিহত জামাল ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং অঞ্চলের একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। অন্যান্য যেসব নাম দাঙ্গার সূত্রে আলোচিত হয়, তাদের মধ্যে আছে শিয়ালদহের ভানু বোস, খিদিরপুরের শেখ বাবু, তালতলার বাসু মিঞা, শ্যামবাজারের কালু। যুবকরা প্রথমে দাঙ্গায় নেমেছিল আত্মরক্ষার চেতনা থেকে; পরে তা প্রতিহিংসার রূপ নেয় এবং তাদের মধ্যে জেগে ওঠে অমানুষিক এক জিঘাংসার মনোবৃত্তি। গোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি : আগে থাকতে কিছু হাতবোমা মজুত রাখা হয়েছিল; কিন্তু এত বড় দাঙ্গা হবে ভাবা যায়নি। ১৬ তারিখে পাড়ার কিছু মুসলমান পরিবারকে থানায় পৌঁছে দিয়ে আসা হয়। এক মুসলমান জাদুকর বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হননি। তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় হিন্দু যুবকরা। কিন্তু ওই দিনই সন্ধ্যের পর থেকে বীভৎস দাঙ্গার খবর আসে। জানা যায়, স্থানীয় ফিয়ার্স লেনে, সাগর দত্ত লেনে প্রচুর হিন্দু মারা পড়েছে। তখন ঠিক করা হয়, একটা হিন্দুর লাশ দেখলে দশটা মুসলমানের লাশ ফেলতে হবে। এরপর একদিকে চলে হিন্দুদের 'রেসকিউ' করা অন্যদিকে হিন্দু হত্যার বদলা নেওয়া। গরিব মুসলমানরাই মারা যায় এর ফলে; কারণ তারাই 'পেটের টানে' রাস্তায় বেরিয়েছিল। (সাক্ষাৎকার : ২৩.৭.৯২)

প্রতিহিংসার মনোভাব কোন্ স্তরে গিয়েছিল তার একটি উদাহরণ : বি.পি.এস.এফ ইউনিয়ন অফিসে (মির্জাপুর স্ট্রীটে) এক মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে শুনে দেড়-দুশো লোক হানা দিয়ে দাবি করে, লোকটিকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। বউবাজারে কয়েকজন সহিসকে হত্যার পরিকল্পনা করে স্থানীয় যুবকরা; তাদের

১। Mansergh, *op cit*, pp 240, 302

২। অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

বাঁচিয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দা বিখ্যাত শিল্প-প্রযোজক হরেন ঘোষ। (১৯৪৭-এর জুলাই-এ হরেন ঘোষকেই নৃশংসভাবে হত্যা করে লীগের ভাড়া করা গুণ্ডা)। শ্যামবাজারে বলরাম ঘোষ স্ট্রীট অঞ্চলে একইভাবে এক বৃদ্ধ ডিমওয়ালাকে হত্যার চেষ্টা হয়; দুদিন আগেও তার কাছ থেকে ডিম কিনেছে পাড়ার লোকেরা।[১]

এই যে মনোবৃত্তি, অপর সম্প্রদায়ের যে-কোন লোকই সেখানে শত্রু; তাকে নিধন করাটাই তখন 'কর্তব্য' হয়ে যাচ্ছে। অমানুষিক জিঘাংসার এই মানসিকতা থেকেই হত্যা করা হচ্ছে প্রতিবেশীকে, পাড়ার সুপরিচিত দোকানী, ব্যাপারী বা কারিগরকে। এন্টালিতে এক মুসলমান ভিখিরি হাতের ডাণ্ডা দিয়ে মেরে এক হিন্দুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, এমন দৃশ্যও দেখা গিয়েছিল সেদিন। দাঙ্গা ব্যাপারটা তখন নিছক গুণ্ডামি বা বিক্ষিপ্ত কিছু হাঙ্গামার ঘটনা ছিল না; তা হয়ে উঠেছিল দুই সম্প্রদায়ের একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার লড়াই, প্রায় গৃহযুদ্ধের মতো। 'পরিচয়' (ভাদ্র, ১৩৫৩) পত্রিকায় গোপাল হালদার লিখেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবার বুঝি গৃহযুদ্ধ বা সিভিল ওয়ারের পর্বে এসে ঠেকেছে।'

হিন্দু দাঙ্গাকারীদের মধ্যে কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার ক্যাডাররা যেমন ছিল, যোগ দিয়েছিল তেমনি বিভিন্ন সমিতি-সংগঠনের যুবকরাও। বাঙলায় আখড়া-সমিতি লাঠিখেলা-ছোরাখেলা অনুশীলনের একটা ঐতিহ্য সেই স্বদেশী আমল থেকেই গড়ে উঠেছিল। যে শক্তিচর্চা একদিন শুরু হয়েছিল বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে, সেই শক্তি, সেই বাহুবল-অস্ত্রবলই এখন নিয়োজিত হয় ভ্রাতৃহত্যায়। স্বদেশী-ভাবাপন্ন ক্লাব-সমিতির সদস্যরা অনেকেই দাঙ্গায় যোগ দিয়েছিলেন, বেদনাদায়ক হলেও এই সত্যটি অস্বীকার করা যাবে না। মুসলমান যুবসমাজ যেমন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগ দেওয়াটা নৈতিক এবং ধর্মীয় কর্তব্য মনে করেছিল, হিন্দু যুবকরাও তেমনি দাঙ্গায় নেমেছিল প্রথমত আত্মরক্ষার চেতনা থেকে; সেই সঙ্গে মিশেছিল বাঙলাকে 'যবনমুক্ত' করার 'কর্তব্যবোধ'ও। হিন্দু মহাসভার 'জাগো হিন্দু'-র প্রচার তাদের এই চেতনার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল।

দাঙ্গা যে এত অল্প সময়ে এত বীভৎস রূপ নিতে পেরেছিল, তার আর একটা কারণ : কলকাতায় সেই সময় দুই সম্প্রদায়ের ভেতরই গুণ্ডা-দুর্বৃত্তদের একটা দল বেশ ভালোভাবেই গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধ-মন্বন্তর বাঙলার সামাজিক-আর্থনীতিক ভিত্তিটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। বেকার-বুভুক্ষু একটা যুব সম্প্রদায় পেশাদার গুণ্ডায় পরিণত হয়েছিল। 'আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস' (নভেম্বর, ১৯৪৫) এবং রসীদ আলী দিবসের (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) আন্দোলনেও তাই দেখা যায়, একটা মারদাঙ্গা করার প্রবণতা মিশে গিয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসে এর একটা সূক্ষ্ম ইংগিত আছে : হানিফ বলে একটি চরিত্র এই সুযোগে দোকানপাট ভাঙচুর করতেই আগ্রহী। 'পরিচয়' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবসে 'শহরের গুণ্ডা আর বখাটেরা ... জনবিক্ষোভের সুযোগ' নিয়েছে। রসীদ আলী দিবসের ছাত্র বিক্ষোভের সঙ্গেও একটা 'গুণ্ডামি'র প্রবণতা মিশে গিয়েছিল।[২]

১। মৌখিক সূত্র : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিজয় ঘোষ, নিত্যরঞ্জন সেন

২। 'পরিচয়', অগ্রহায়ণ ১৩৫২; *Amrita Bazar Patrika*, Feb. 13, 1946

কী ধরনের চরিত্র দাঙ্গা করেছিল তার একটা টাইপ কলকাতা দাঙ্গা নিয়ে লেখা রমেশচন্দ্র সেনের গল্প 'সাদা ঘোড়া'য় পাওয়া যায়। চরিত্রটির নাম যমুনাপ্রসাদ। সে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে, জুয়ো খেলে, মদ খায়। কিন্তু 'দাঙ্গার এই কয়দিনে সে বেশ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। যখনই পল্লীর বা নিকটের কোনো দেবমন্দির আক্রান্ত হয় তখনই সর্বাগ্রে শোনা যায় যমুনার কণ্ঠস্বর। সে সকলের আগে আগে ছুটিয়া চলে।' হানিফ-যমুনাপ্রসাদের মতো চরিত্ররাই খুনখারাবি করেছে, আবার তারাই বাঁচিয়েছে অঞ্চলের স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষকে। স্থানীয় মানুষের চোখে তারা 'ক্রিমিনাল' নয়; ত্রাতা, রক্ষাকর্তা।

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা—এই সব নাম বা দলীয় পরিচয়টা তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। একদল দাঙ্গা চাইছে, একদল চাইছে না—ভাগটা ছিল এরকম। এই সীমারেখাটাও আবার স্থিরনির্দিষ্ট ছিল না; আজ যে প্রতিরোধ কমিটিতে যোগ দিয়েছে, পরের দিন নিদারুণ নৃশংস এক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী শুনে সে-ই প্রত্যক্ষভাবে নেমে পড়েছে দাঙ্গায়। বাঙলার বা কলকাতার পরিজ্ঞাত ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা।

চার দিনের টানা দাঙ্গা কলকাতাকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে যায়। বড়ো আকারে দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পরও বিক্ষিপ্ত ঘটনা চলতেই থাকে। পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিদ্বেষ আর ঘৃণা দূষিত করে দেয় সাধারণের মন। কলকাতার সমাজ কার্যত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যায়। এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের এলাকায় প্রবেশ করতে সাহস পান না। নালা-নর্দমা-হাইড্র্যান্ট থেকে গলিত মৃতদেহ বের হতে থাকে মাঝে মাঝে; আর মানুষের মুখে মুখে থাকে ইতরতার, পৈশাচিকতার, নৃশংসতার কাহিনী। বাজারে জিনিস অগ্নিমূল্য হয়; শারদীয় উৎসবে বাজে বিষাদের চাপা সুর; এক বিষাদাচ্ছন্ন পরিবেশে পালিত হয় ঈদ উৎসব। ৩০,০০০ মানুষ তখনও ঘরছাড়া হয়ে আছেন কলকাতায়। ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে আশুতোষ কলেজে, লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে, যশোদা ম্যানসনে।

অগাস্ট মাসের শেষেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্যাট্রিক স্পেন্স, একজন হিন্দু প্রতিনিধি আর পাটনার বিচারপতি ফজল আলীকে নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানের জন্যে। প্রায় ৩,৫০০ বিবৃতি কমিশনের কাছে জমা পড়ে; কিন্তু সাধারণ মানুষের এই তদন্তে খুব আগ্রহ ছিল না।[১] কলকাতার নজিরবিহীন নৃশংসতা এক নিদারুণ দাগা রেখে গিয়েছিল মানুষের মনে, আর এই ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই আবার দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়—প্রথমে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে, পরে বিহার-উত্তরপ্রদেশে।

১। *Amrita Bazar Patrika*, Oct. 13, 1946

দাঙ্গার বিস্তার

নোয়াখালি থেকে বিহার

নোয়াখালি : পাশব আচার আর নিষ্ঠুরতা

নোয়াখালি দাঙ্গা শুরু হয় ১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে। এই দাঙ্গায় একতরফা আক্রমণ চালানো হয়েছিল হিন্দুদের ওপর এবং খুনজখমের পাশাপাশি ছিল নারী ধর্ষণ, জোর করে বিয়ে, ধর্মান্তরণ। গোঁড়া মৌলভিদের প্ররোচনায় একটা সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়েই ঘটানো হয়েছিল এই দাঙ্গা।

কলকাতার বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে তখন একটা বেশ বড় অংশ ছিল নোয়াখালি থেকে আসা মুসলমানেরা; গ্রামে ফিরে তারা কলকাতা দাঙ্গাকে নির্বিচার মুসলমান নিধনের ঘটনা বলে প্রচার করে; এই প্রচার দাঙ্গা উস্‌কে দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। বিশের দশকে বন্দর শ্রমিকদের নিয়ে সোহরাবর্দি ইউনিয়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। ওই শ্রমিকদের একটা বড় অংশ ছিল লীগের সমর্থক। তাদের প্রচারিত কলকাতা দাঙ্গার বিবরণে সাম্প্রদায়িক উসকানি ছিল, এমন মনে করার কারণ আছে। তবে দাঙ্গাটা ঘটানোর পিছনে গোঁড়া মৌলভিদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ছিল। প্রধান সংগঠক হিসাবে গোলাম সারওয়ার নামে এক মৌলভির নামও পাওয়া যায়। ৭ অক্টোবর মৌলভিদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে। এরপর মসজিদে মসজিদে সভা এবং প্রচার চলতে থাকে।[১]

নোয়াখালি মুসলমান মৌলবাদের একটা ঘাঁটি ছিল; এই মৌলবাদীরাই দাঙ্গাটা লাগায়। তবে সাধারণ মুসলমান চাষিও যে দাঙ্গায় যোগ দিয়েছিল, তার পিছনে একটা অর্থনৈতিক কারণও ছিল। নোয়াখালিতে তখন হিন্দুরা ছিল জনসংখ্যার মাত্র ১৮ শতাংশ; অথচ জমির প্রায় ৭৫ শতাংশই দখল করে রেখেছিল তারা। মুসলমান চাষির ওপর হিন্দু জমিদারের অত্যাচার সাধারণ মুসলমানের মনে বহুদিন ধরে যে ক্ষোভ জমিয়ে তুলেছিল, তারই এক বীভৎস বিকৃত প্রকাশ নোয়াখালি দাঙ্গা।

মুসলমানদের মধ্যে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছিল এবং হিন্দুদের সঙ্গে তাদের স্বার্থের একটা সংঘাত দানা বাঁধছিল। মৌলবাদীদের সঙ্গে এই নবোদ্ভিন্ন মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিও দাঙ্গা সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়; সাধারণ মুসলমান চাষির হিন্দু জমিদার-বিরোধী মনোভাবকে তারা কাজে লাগায় নিজেদের স্বার্থে।[২]

১০ অক্টোবরের আগেই দাঙ্গার একটা ছক তৈরি করে ফেলা হয়েছিল; এবং লীগ সরকারেরও তাতে মদত ছিল। যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়; দাঙ্গার খবর

১। Abul Hashim, *In Retrospection*, pp 118-20,
The Transfer of Power, Vol IX, ed by N. Mansergh, pp 98-99

২। N K. Bose, *My Days with Gandhi*, pp 33,59

যাতে বাইরে না যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়; ১৫ অক্টোবরের আগে সংবাদপত্রে এই দাঙ্গার কোন খবরই প্রকাশিত হয়নি। ওই দিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতি থেকে জানা যায়, দাঙ্গাবাজরা গ্রামে গ্রামে হামলা চালাচ্ছে; ব্যাপক হারে খুনজখম, লুঠপাট আর আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে : Riotious mobs with deadly weapons are raiding villages and looting, murder and arson are continuing ... on a very large scale.

১৬ অক্টোবর বেঙ্গল প্রেস অ্যাডভাইজারি কমিটির রিপোর্টে দাঙ্গার বিবরণ পাওয়া যায় এ-রকম : হাজার হাজার গুণ্ডা গ্রামবাসীদের ওপর চড়াও হয়েছে, গো-হত্যা করেছে, গ্রামবাসীদের জোর করে গো-মাংস খাইয়েছে এবং অনেক মেয়েকে হরণ করেছে বা জোর করে বিয়ে করেছে। এ ছাড়া ধর্মস্থানের ওপর আঘাত এবং অসংখ্য গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার উল্লেখও ওই রিপোর্টে পাওয়া যায়।[১]

ওইদিনই গভর্নরের গোপন রিপোর্টে লেখা হয় : এক বিশাল মুসলমান গুণ্ডাবাহিনী গ্রামে গ্রামে হামলা চালাচ্ছে, হিন্দুদের ভয় দেখাচ্ছে, লুঠপাট খুনজখম করেছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মেয়েদের নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের জোর করে মুসলমান করে দিচ্ছে : Large bands of Moslem hooligans [are] ... moving about terrorising Hindus and committing acts of arson loot and murder, kidnapping and forcibly converting Hindus।[২] অথচ লীগপন্থী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' (১৭ অক্টোবর) ঘটনাটাকে বর্ণনা করে 'স্থানীয় হাঙ্গামা' বলে এবং অভিযোগ করে, হিন্দু পত্রিকায় 'অতিরঞ্জিত' সংবাদ দেওয়া হচ্ছে।[৩]

১৮ অক্টোবরের মধ্যেই শত শত হিন্দু পরিবার ঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। দাঙ্গা কম করে সাতদিন ধরে চলে; বিশেষভাবে আক্রান্ত এলাকাগুলি ছিল : রামগঞ্জ, লখিমপুর, বেগমগঞ্জ, লামচর, নবগ্রাম এবং শ্রীরামপুর। ২৪ অক্টোবর দ্য স্টেট্সম্যান পত্রিকায় লেখা হয়, বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ৩,০০০ ছাড়িয়ে গেছে এবং : Arson, looting, murder, abduction of women, forced conversions and forced marriages are everywhere.

নোয়াখালি দাঙ্গায় কতজন প্রাণ হারিয়েছিল, তার সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। প্রথমদিকের বিবরণে শত শত প্রাণহানির কথা বলা হলেও, পরবর্তী হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৩০০ দেখানো হয়েছে। তবে নৃশংসতায় নোয়াখালি সম্ভবত কলকাতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল; কোন কোন ক্ষেত্রে গোটা পরিবারকেই হত্যা করা হয়। শায়েস্তানগরে জনৈক চিত্ত রায় গুণ্ডাদের বাধা দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের মাকে নিজে হাতে হত্যা করে তারপর আত্মহত্যা করেন।[৪] হিন্দু মহাসভা নেতা রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সুরেনবাবু নামে আর এক জমিদারের কাটা

১। *Amrita Bazar Patrika*, 16 Oct 1946

২। Mansergh, *op cit* Vol. VIII, p 743

৩। তবে লীগ সরকারের মন্ত্রী সামসুদ্দিন আহমদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই দাঙ্গার নিন্দা করেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন যে, হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে এবং নারীদের 'শ্লীলতাহানি' করা হয়েছে।

(দীনেশচন্দ্র সিংহ, 'নোয়াখালির মাটি ও মানুষ', পৃ. ১২৮)

১। বীণা দাস, 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার', পৃ. ১৬৮

মাথাটা গোলাম সারওয়ারকে ভেট দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। স্থানীয় শিক্ষক এবং মহাসভা নেতা নলিনীরঞ্জন মিত্রকেও হত্যার চেষ্টা হয়েছিল; কাদের মিঞা নামে এক মাঝির চেষ্টায় তিনি রক্ষা পান; তবে তাঁকে আশ্রয় দেবার অপরাধে রমেশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।[১] ২৬ অক্টোবর দ্য স্টেট্‌সম্যানে প্রকাশিত এক কিশোরীর বিবৃতি থেকে জানা যায়, গুণ্ডারা তার বাবাকে হত্যা করে ভাইকে বাবার মৃতদেহের ওপর বসিয়েছিল; তারপর তারা পরিবারের অন্যান্যদের মারধোর করে এবং লুঠপাট করে জিনিসপত্র। দাঙ্গার চরিত্র ছিল পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক। আবুল হাশিম, যোগেন মণ্ডল এবং সামসুদ্দীন আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'Hooligans ... have conducted depredation on communal lines.'[২] মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় লেখা হয়, যারাই দাঙ্গায় বাধা দিতে গেছে, তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে, তাদের ঘরবাড়ি লুঠ হয়েছে, এমনকি রান্নার বাসন-কোসনও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কলকাতা দাঙ্গার পর গ্রামে যারা শান্তি কমিটি তৈরি করেছিল, তারাই দাঙ্গা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়।[৩] দাঙ্গাকারীরা লীগের পতাকাও ব্যবহার করেছিল।

নোয়াখালিতে গান্ধীজী

অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা

নোয়াখালিতে দাঙ্গার সবচেয়ে বীভৎস দিক ছিল নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার। নারীত্বের এই অবমাননাই, গান্ধীর ভাষায়, তাঁকে টেনে এনেছিল নোয়াখালিতে : It is the cry of outraged womanhood that has promptly called me to Noakhali.[৪] গান্ধী নোয়াখালিতে পৌঁছান ৬ নভেম্বর, গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাঁকে শুনতে হয় বর্বরতার, অমানুষিকতার মর্মন্তুদ কাহিনী। একটি সভায় ২১টি কঙ্কাল নিয়ে এসে তাঁকে দেখানো হয়; জগতপুরের একটি সভায় স্বামীহারা এক নারী দাঙ্গায় নিহত তাঁর স্বামীর দেহের একটি হাড় গান্ধীকে নিয়ে এসে দেখান। নারীদের ওপর কিভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছে, বৃদ্ধাদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি, কিভাবে জোর করে ধর্মান্তরণ করা হয়েছে—তার সব বিবরণ গ্রামবাসীরা শোনান গান্ধীকে।[৫]

গান্ধীর নোয়াখালি যাত্রার অন্যতম সঙ্গী সুচেতা কৃপালনী ধর্ষিতা নারীদের সঙ্গে কথা বলে যে বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তা পড়লে শিহরিত হতে হয় : 'অনেক স্ত্রীলোক শ্রীযুক্তা কৃপালনীর নিকট তাহাদের প্রতি অত্যাচারের, বিবাহিত জীবনের প্রতীক তাহাদের শাঁখা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার এবং সিঁদুর মুছিয়া দিবার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে। এক জায়গায় দুর্বৃত্তরা স্ত্রীলোকদিগকে মাটিতে ফেলিয়া পায়ের আঙ্গুল দিয়া তাহাদের সিঁদুর

১। কানাই বসু, 'নোয়াখালির পটভূমিকায় গান্ধীজী', পৃ. ৩৮; Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal*, p 197 , দীনেশচন্দ্র সিংহ, 'নোয়াখালির মাটি ও মানুষ', পৃ. ১৩০-৩৬
২। উদ্ধৃত হয়েছে :'বঙ্গশ্রী' (পত্রিকা), কার্তিক ১৩৫৩
৩। *Modern Review*, Nov 1946
৪। M. K. Gandhi, *The way to Communal Harmony*, p 162
৫। N. K. Bose, op cit, p 145; কানাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

মুছিয়া দেয়।'[১] শ্রীমতী কৃপালনী লেখেন, 'ধর্ষিতা ও অপহৃতা নারীর সঠিক সংখ্যা প্রদান অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে অনুসন্ধানের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তাদের সংখ্যা বহু।' নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের নেত্রী ফুলরেণু গুহ-র বিবরণেও নারীদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়।[২] রেণু চক্রবর্তী দেখেন, 'গ্রামের পর গ্রাম যেন শ্মশান। কদাচিৎ কোন জায়গায় আমাদের হিন্দু দেখে এক-আধজন বৃদ্ধা বেরিয়ে আসত এবং নোয়াখালির ভাষায় বলত, গুণ্ডারা বলে দিয়েছে, 'কিছু কইবা তো কাইট্টা ফালামু।'[৩]

অত্যাচারিতা নারীরা গান্ধীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কিভাবে তারা তাদের সম্মান রক্ষা করতে পারেন? অহিংসার সাধক মহাত্মাকে বলতে হয়েছিল, 'আত্মরক্ষার জন্য তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ছুরিকা রাখিতে পারেন।[৪] 'অমর্যাদার নিকট আত্মসমর্পণের' বদলে আত্মহত্যাই শ্রেয় বলে মত দিয়েছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু ৩১ জানুয়ারি নবগ্রামের একটি সভায় তাঁকে বলতে হয় : 'ভীরুতা প্রদর্শন অপেক্ষা বরং হিংসার পথ গ্রহণীয়;' আর একটি সভায় তিনি এমনও বলেন যে, 'দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যে সকল নারী বিনা অস্ত্রে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে অস্ত্র হাতে লওয়ার পরামর্শ দিতে হয় না; তাঁহার নিজেরাই অস্ত্র হাতে লইবেন।[৫] গান্ধীজীকে এই কথা বলতে হয়েছিল, কারণ নিপীড়িতা নারীদের মুখে তিনি দেখেছিলেন অবরুদ্ধ ক্রোধ, গভীর এক নিরাপত্তাহীনতার ছাপ।

নোয়াখালি বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এমন এক ফাটল সৃষ্টি করেছিল, যা গান্ধীজীর পক্ষেও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। নোয়াখালির গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন বলেছিলেন, নোয়াখালি তাঁর অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা : I have come to put my Ahimsa to the acid test in this atmosphere of rank distrust and suspicion. তাঁর অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, নিপীড়িতদের 'চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া', তাদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া যেখানে দুই সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস কাটিয়ে উঠে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয়নি। হিন্দুরা মহাত্মার কথায় খুব বেশি আস্থা রাখতে পারেনি; মুসলমানেরা তাঁর সভায় যোগ তো দেয়-ইনি, এমনকি তাঁকে লক্ষ্য করে ময়লা ছুঁড়েছে, তাঁকে ব্যঙ্গ করেছে।[৬] বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছে তাঁর অভিযানকে। গান্ধীকে বার বার কবুল করতে হয়েছে, তিনি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নোয়াখালিতে আসেননি।[৭]

নোয়াখালি, গান্ধীর অহিংসা-তত্ত্বের যথার্থ অগ্নিপরীক্ষা। নোয়াখালির মতো

১। কানাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
২। ঐ, পৃ. ২৫-২৬, ৫৭
৩। রেণু চক্রবর্তী, 'ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা', পৃ. ৮৭
৪। কানাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
৫। ঐ, পৃ. ২০৪-২০৫
৬। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম : আমতুস সালাম নামে এক মুসলমান রমণী গান্ধীজার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনশন করেন।
৭। Sandip Bandyopadhyay, 'Gandhiji's Non Violence : Noakhali Trial', *Frontier*, 17 Aug. 1991

পরিস্থিতিতে অহিংসার বাণী প্রচারে যে খুব কাজ হয় না, এটা গান্ধী নিজেও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তা তিনি স্বীকারও করেছেন। নোয়াখালিতে পৌঁছনোর এক মাসের মধ্যেই তাঁকে বলতে হয় : Never in my life has the path been so uncertain and so dim before me. গান্ধী স্বীকার করেন, 'আমার অহিংসা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাড়া দেয় না বলিয়াই মনে হয়।'[১] যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ সহ্য করে, নড়বড়ে বাঁশের সেতু ডিঙিয়ে গ্রামের কাদামাখা পথ দিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হাঁটতে ৭৭ বছরের এই বৃদ্ধের এক সময় মনে হয়, ব্যর্থতা নিয়েই হয়তো তাঁকে মরতে হবে; 'আমি যদি ব্যর্থ হই ঈশ্বর যেন আমাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেন।' কেউ তার ডাক না শুনলেও রক্তমাখা চরণতলে পথের কাঁটা দলে একলা চলার এক মহিমময় দৃষ্টান্ত রচনা করে যান মহাত্মা; কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি নোয়াখালিতে এসেছিলেন, তা সফল হয় না; হওয়া সম্ভবও ছিল না। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তখন কতটা বিপজ্জনক, কতটা বিষগর্ভ হয়ে উঠেছে, নোয়াখালিতে গান্ধীর ব্যর্থতা তারই সূচক।

মুসলমানেরা বেপরোয়া ছিল; তারা ভুলতে পারছিল না হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের কথা; কলকাতা এবং বিশেষত বিহারে মুসলমান হত্যার কথা; ফলে গান্ধীর শান্তি অভিযানে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। নোয়াখালি থেকে ফেরার পথে ট্রেনে বীণা দাসের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক শিক্ষিতা মুসলমান তরুণীর। বীণা দাসকে সে বলেছিল, 'কুকুর-বেড়াল পাতের কাছে গেলে আপনারা ভাত ফেলেন না। আমরা গেলে সে ভাত আপনাদের খাওয়া চলে না। এত ঘৃণা মনের মধ্যে রেখেও আপনারা আশা করেন, আমরা আপনাদের আপন ভাবব?'[২] এর উত্তর বীণা দাস দিতে পারেননি। কোন হিন্দুর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়; গান্ধীর পক্ষেও না। তাই মুসলমানেরা তাঁর অহিংসার বাণীতে আগ্রহ না দেখালে তাঁর কিছু করার ছিল না।[৩]

হিন্দুরাও গান্ধীর কথায় খুব বেশি আস্থা রাখতে পারেনি; পারার কথাও ছিল না বিশ্বাসের সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল—নোয়াখালি তা একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। গান্ধীর বারবার আবেদন সত্ত্বেও তাই তারা স্বগ্রামে ফিরে যেতে রাজি হয়নি। সে ভরসা তাদের ছিল না। 'শতকরা আশি জন যেখানে তাদের চায় না সেখানে বিশজন থাকবে কোন্ দুঃখে, কোন্ স্বস্তিতে, কোন্ ভরসায়?'[৪]—এই ছিল তাদের মনোভাব, আর এই মনোভাব গড়ে ওঠার সংগত কারণও ছিল। নারীদের মনে ছিল গভীর একটা ত্রাসের ভাব। ঘটনার এক-দেড় মাস পরেও বিবাহিতা নারীরা কপালে সিঁদুর দিতে ভয় পেতেন।

হিন্দু পত্র-পত্রিকাগুলিতেও গান্ধীর নোয়াখালি অভিযানে খুব আগ্রহ দেখানো হয়নি। অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল বরং মুসলমানের অত্যাচার, বিশেষত নারীদের ওপর

১। কানাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪; N. K Bose, *op cit*, pp 97-99

২। বীণা দাস, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩

৩। নোয়াখালি ছেড়ে চলে আসার সময় গান্ধীজী রেখে এসেছিলেন নিষ্ঠাবান কর্মী চারু চৌধুরীকে। আয়ুব এবং ইয়াহিয়া খানের অত্যাচার সহ্য করেও আজীবন নোয়াখালিতে মৈত্রী প্রচারের কাজ করেছেন চারু চৌধুরী। ১৩ জুন, ১৯৯০ তাঁর মৃত্যু হয়। (দি স্টেট্সম্যান, ১৪.৬.৯০)

৪। N. K. Bose, *op cit*, p 93; গোপাল হালদার, 'সংস্কৃতি না বিকৃতি!', পুনর্মুদ্রণ—'পরিচয়', জানুয়ারি ১৯৮০

পাশবিক আক্রমণ। 'শনিবারের চিঠি' (কার্তিক ১৩৫৩) দাবি তোলে, সব আগে আক্রান্ত নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। 'মডার্ন রিভিউ' (নভেম্বর ১৯৪৬) লেখে, প্রতিটি বলপূর্বক বিবাহ-ই বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে। এ ব্যাপারে শাস্ত্রীয় নির্দেশের উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন রমা চৌধুরী। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার উদ্যোগে অপহৃতা নারীদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ বিধান দেন, 'বলপূর্বক বিবাহ হইয়া থাকিলেও তাহা শাস্ত্রদৃষ্টিতে বিবাহই নহে। তাহাদের সকলেই স্বসমাজে পূর্ববৎ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন।' আত্মশুদ্ধির জন্য গঙ্গাজল পান, গঙ্গাস্নান, হরিনাম উচ্চারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখ।[১] নারী-নিপীড়নের ঘটনাটিকে প্রচারের কাজে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছিল হিন্দু মহাসভা এবং অন্যান্য কয়েকটি সংগঠন।

কমলা দাশগুপ্ত লিখেছেন, নোয়াখালিতে কিছু যুবক ধর্ষিতা নারীদের বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল; কিন্তু প্রস্তাবটি কার্যকর করা যায়নি, কারণ অনেক মেয়েই তাদের পরিবারে ফিরে গিয়েছিল; কারোর কারোর বয়স খুবই কম ছিল। প্রস্তাবটি গান্ধীও খুব পছন্দ করেননি; কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, এরকম ঘটনা খুব বেশি নেই : I do not think that the extent of the evil is so great. Many such cases have not come under my observation.[২] নোয়াখালিতে গান্ধীর একটি সভায় উপস্থিত একজন বলেছেন, ধর্ষিতা নারীদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটি গান্ধীকে বারবারই শুনতে হয়েছিল অত্যাচারিতা নারীরা নিজেরাই দেখা করেছিলেন গান্ধীর সঙ্গে।

নোয়াখালির সঙ্গে ত্রিপুরা এবং পূর্ববঙ্গের আরও কয়েকটি অঞ্চলেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ববঙ্গের এই পর্যায়ের দাঙ্গার দুই শহিদ : ভূদেব সেন আর লালমোহন সেন। দু-জনেই প্রাণ দিয়েছিলেন দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে। ভূদেব (ননী) গান্ধীবাদী কর্মী, আইন অমান্য (১৯৩০) এবং ভারত ছাড়ো (১৯৪২) আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন লালমোহন সেন চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক; আন্দামানের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। মণি সিংহের 'জীবন সংগ্রাম' গ্রন্থে (পৃ. ২৫০) জহিরুদ্দীন নামে আর একজন শহিদের উল্লেখ আছে। রেল শ্রমিক জহিরুদ্দীন প্রাণ দিয়েছিলেন হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে।

নোয়াখালির শোচনীয় ঘটনা, বিশেষত নারীদের ওপর অত্যাচার এবং ধর্মান্তরণ, বাঙলার হিন্দু মনে খুব বেশি রকম ঘা দিয়েছিল। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নারী কর্মীরা নোয়াখালিতে যান এবং অত্যাচারিতা নারীদের পুনর্বাসনের কাজে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাস, উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়, লীলা রায়, অশোকা গুপ্ত, আশালতা সেন, রেণু চক্রবর্তী প্রমুখ। তবে কতজন নারী অপহৃতা হয়েছিলেন, তার সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

১। 'শনিবারের চিঠি', কার্তিক ১৩৫৩

২। কমলা দাশগুপ্ত, 'রক্তের অক্ষরে', পৃ. ১৫৭; সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যও লিখেছেন, অপহৃতা নারীর সংখ্যা বেশি ছিল না। 'যেমন দেখেছি', পৃ. ২১১-১৩

নোয়াখালি
প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিতে

বিরাজমোহন ঘোষ, এখন বয়স ৬৫, শ্রীরামপুরে স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালসের শ্রমিক কারখানা বন্ধ আছে এক বছরেরও বেশি হল। ১৯৪৬-এ কলকাতায় কাজ করতেন থাকতেন এন্টালিতে। দেখেছেন ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গা; তারপর বাড়ি চলে যান নোয়াখালিতে; গ্রামের নাম : ছয় আনি টপ গাঁ; থানা রামগঞ্জ। নিজে চোখে দেখেছেন নোয়াখালির তাণ্ডব; আক্রান্ত হয়েছে তাঁর নিজের পরিবারও। ৯ এপ্রিল, ১৯৯২ তিনি আমাদের শোনান তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী : দাঙ্গার কয়েকদিন আগে দেশে যাই। মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল যে, কলকাতায় 'মোছলমানদের' একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়েছে; দেয়ালে পেরেক দিয়ে গেঁথে মারা হয়েছে মহিলাদের। অবস্থাটা থমথমে ছিল। আমি কলকাতা থেকে ফিরছি শুনেই মুসলমানরা আমার কাছে ছুটে আসে; জানতে চায় কলকাতার কথা। হাবভাবটা ভালো লাগেনি।

দাঙ্গার কদিন আগে থাকতেই মসজিদে খুব গরম গরম মিটিং হচ্ছিল। গুজব রটে যে, লক্ষ্মীপুজোর দিন, হাঙ্গামা হবে; হিন্দুদের বাড়ি পুড়বে। গ্রামের মুসলমানেরা এসে বলে, কি কত্তা, পুজো করবেন না? করবেন, আমরা নাড়ু খেতে আসব। তারপর অদ্ভুত হেসে চলে যায়। তখনও এতটা বুঝতে পারিনি।

পুজোর দিন সকালে প্রতিমা কিনতে গিয়ে বাধা পেলাম। ওরা প্রতিমা কিনতে দিল না। বাড়ি এসে মাকে বললাম, ঘটে পুজো হবে; বিকেল-বিকেল পুজো সেরে নিতে হবে। বিকেলে আবার লক্ষ্মীপুজো হয়! মা অবাক। বললাম, এবার তা-ই হবে। হলও তাই। ওরা এসে পেসাদ চাইল। দেওয়া হল। সন্ধ্যের পরই শুনলাম, রাজেন চৌধুরীকে কেটে ফেলেছে; আরও কয়েকটা বাড়িতে আগুন দিয়েছে। রাত কাটল দুশ্চিন্তায়।

পরের দিন সকালে কয়েকজন এসে বলল, বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে হবে। মেয়েদের একলা রেখে যাব! ভয় করছিল; তবু গেলাম। অফিসে আমাদের বলা হল : আমরা কি স্বেচ্ছায় মুসলমান হতে রাজি আছি? 'নইলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বাবা-কাকা সঙ্গে ছিল; ওদের দিকে তাকালাম। তারপর বললাম, রাজি আছি। ওরা কলমা পড়াল; মাথায় টুপি পরাল; তারপর বলল, যাও মোছলমান হয়ে গেলে।

বাড়িতে ফিরে এসে প্ল্যান করি, পালাব। কিন্তু আমাদেরই এক হিন্দু প্রতিবেশী কথাটা ফাঁস করে দেয়। ওরা এসে খুব শাসায়। পালানো আর হল না। এর মাঝে আশপাশের বাড়িতে খুব হামলা হচ্ছে। ওরা এসে বলল, আমার বোন সুভাষীর বিয়ে দেবে তার খুড়তুতো ভায়ের সঙ্গে। মেনে নিতে হল। বিয়ে হল। গোরু জবাই হল। মাংস-ভাত রাঁধা হচ্ছে; এমন সময় খবর এল, মিলিটারি আসছে। ওরা ভয় পেয়ে পালাল।

তারপর একদিন এসে বলল, আমার বিয়ে দেবে, আমারই এক বোনের সঙ্গে। বাবা কাটানোর জন্য বলল, না আমরা এখন মুসলমান হয়ে গেছি; মুসলমানের মেয়ের সঙ্গেই আমার ছেলের বিয়ে হবে; তোমরা মেয়ে খোঁজো। ওরা মেয়ে খুঁজতে লাগল। এই করতে করতে অবস্থা কিছুটা ভালো হল; দাঙ্গা কমল; 'বিয়ের' হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

তখন গ্রামে মিলিটারি আসছে। আমাদের জিজ্ঞেস করে, কেউ অত্যাচার করেছে কি-না। ওরা একটু ভয়ে আছে। থানার দারোগা মুসলমান, ভালো লোক। হিন্দুদের

ওপর অত্যাচার মোটেই সমর্থন করেননি। কিন্তু আমাদের ভয় তবু যাচ্ছিল না। আবার পালানোর প্ল্যান করলাম। রাতে নৌকো করে পালাব। প্রতিবেশী দু-একটা পরিবারও রাজি হল। মাঝিরা সাহায্য করেছিল; কিন্তু মাঝপথে ওরা খবর পেয়ে গেল। আমার জ্ঞাতি জেঠা অনুকূল ঘোষকে কেটে ফেলল। জেঠিমা সঙ্গে আছে; আরও কটা পরিবারও আছে। কোনরকমে তাদের নিয়ে তুললাম আমবাগানের একটা উঁচু জমিতে। তারপর রাতের অন্ধকারে তালডোঙায় করে গিয়ে খবর দিয়ে এলাম মিলিটারি ক্যাম্পে। পুরো একদিন সেইসব পরিবারের লোকজনকে নিয়ে পাহারা দিয়ে বসেছিলাম সেই আমবাগানে। মনে হচ্ছিল, যেন শ্মশানে বসে আছি—মড়া আগলে। তারপর মিলিটারি এল। ওদের সাহায্য নিয়ে পালিয়ে এলাম।

আর কোনদিন যাইনি।

বিহার

প্রমত্ত হিংসার প্রদর্শনী

কলকাতায় কাজ করতে আসা বিহারের মানুষ দেশে ফিরে গিয়ে কলকাতা দাঙ্গায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচ্যারর কাহিনী শোনান; সেই সঙ্গে সংবাদপত্র মারফত নোয়াখালি দাঙ্গার খবরও ছড়িয়ে পড়ে; দু-সপ্তাহের মধ্যেই দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় ছাপরায়; পরে তা অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে যায়। পাটনা, গয়া, ছাপরা, ভাগলপুর, মুঙ্গের—প্রধানত শহরাঞ্চলে শুরু হয়ে পরে গ্রামেও দাঙ্গা ছড়ায়; প্রায় একতরফাভাবে হিন্দুরা আক্রমণ চালায় মুসলমানদের ওপর। হিন্দু চাষি হত্যা করে মুসলমান চাষিকে।

নোয়াখালি দাঙ্গার পিছনে যেমন মৌলভিদের উসকানি ছিল, বিহার দাঙ্গায় তেমনি মদত দিয়েছিল হিন্দু জমিদারশ্রেণী আর হিন্দু মহাসভার প্রচার। দ্বারভাঙ্গার জমিদার নিজে দুটি কাগজ চালাতেন—'সার্চলাইট' আর 'দি ইন্ডিয়ান নেশন'। এই দুটি পত্রিকায় পূর্ববঙ্গে মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উত্তেজিত করে খুবই প্ররোচনাময় লেখা ছাপা হয়; হিন্দুদের তাতিয়ে তোলা হয় এই বলে যে, পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগ 'গুণ্ডারাজ' চালাচ্ছে : সেদিন আর নেই যে হিন্দুরা অসহায়ের মতো উৎপীড়নকারীদের আক্রমণ সহ্য করবে।[১]

দাঙ্গা শুরু হয় ২৫ অক্টোবর, পাটনা আর ছাপরায়। নোয়াখালির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস ডেকেছিল সেদিন হিন্দুরা। নোয়াখালির মতো এই দাঙ্গার খবরও প্রথম ক-দিন প্রচারিত হয়নি। ২৯ অক্টোবর দ্য স্টেট্‌সম্যানে শুধু লেখা হচ্ছে, ছাপরায় দাঙ্গা হয়েছে, ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর ৩১ তারিখের খবর : দাঙ্গা মারাত্মক চেহারা নিয়েছে মৃতের সংখ্যা ৪/৫০০। ৬ নভেম্বর লেখা হচ্ছে, অবস্থার উন্নতি হয়েছে; কিন্তু বহু মানুষ ঘরছাড়া; পাটনা শহরে উদ্বাস্তুর ভিড়। ৮ নভেম্বরের দ্য স্টেট্‌সম্যান থেকে জানা যাচ্ছে, কোন কোন অঞ্চলে পুরো গ্রাম মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুঙ্গেরের একটি গ্রাম

১। Anita Inder Singh, *The Origins of the Partition of India*, p 198

থেকেই ২২৬টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ২০,০০০ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছেন পাটনায়।

মুসলিম লীগ দাবি করেছিল, এই দাঙ্গায় ৩০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে; কংগ্রেস ওই সংখ্যাকে কমিয়ে দেখায় দু-হাজার।[১] সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, ওই দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা ছিল অন্তত ৭,০০০।[২] বিহার দাঙ্গার প্রমত্ততা অনেককেই স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। হিন্দুদের পত্রিকা 'মডার্ন রিভিউ'কে লিখতে হয়, এ দাঙ্গার ভয়াবহতা বাঙলার থেকে আরও অনেক বড় আকারের : of far greater dimensions and fury than those of Bengal. 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩) স্বীকার করা হয়, 'যে সম্প্রদায়ের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে বিহারে উহা সংখ্যালঘিষ্ঠ।' এই দাঙ্গায় হিন্দু জমিদারদের মদতের এবং বিহারের কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতার কথা পরোক্ষে স্বীকার করেন নেহরুও। ৪ নভেম্বর বিহারে উপদ্রুত অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখে নেহরু মন্তব্য করেন, যা ঘটেছে তা ভয়াবহ; এই ধরনের হিংসা দিয়ে স্বাধীনতা আসত পারে না : What has occured is terrible ... Violence like this will not bring freedom for the country. (দ্য স্টেট্সম্যান, ৫ নভেম্বর)। কংগ্রেস নেতা ডা. মাহমুদের বিবৃতিতেও হিন্দু অফিসারদের সাম্প্রদায়িক আচরণের কথা স্বীকার করা হয়েছিল।

লীগপন্থী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'-এ দাঙ্গার বিবরণ পাওয়া যায় এ-রকম : সশস্ত্র হিন্দু গুণ্ডারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, মুসলমানদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়েছে আক্রমণ হয়েছে মসজিদের ওপর। অভিযোগ করা হয়, হিন্দু সরকারি অফিসাররা দাঙ্গা বন্ধ করার চেষ্টা করেনি; বরং প্ররোচনা দিয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে; নোয়াখালির কথা তুলে উত্তেজিত করা হয়েছে হিন্দুদের।[৩]

কংগ্রেস নেতা ডা. মাহমুদের বিবৃতিতেও এই অভিযোগের সমর্থন পাওয়া যায়। মাহমুদ লেখেন, সরকারি কর্মচারীদের ঔদাসীন্য এবং অবহেলা অবর্ণনীয়। দাঙ্গার এক হৃদয়বিদারক বর্ণনা পাওয়া যায় ডা. মাহমুদের বিবৃতিতে : একটা গ্রামে আমি অন্তত পাঁচটা কুয়ো দেখেছি মড়ায় ভর্তি; আর একটা গ্রামে ১০-১২টা কুয়োর একই অবস্থা। আমাদের হাঁটতে হয়েছে মানুষের মাথার খুলি আর হাড় মাড়িয়ে : Skulls and bones met our feet as we trod through the lanes. মাহমুদের হিসাবে ৩.৫ লক্ষ মুসলিম পরিবারকে উদ্বাস্তু করে দিয়েছিল বিহারের দাঙ্গা।[৪]

বিহার দাঙ্গার কয়েকদিন পরেই ৮ নভেম্বর থেকে দাঙ্গা শুরু হয় উত্তরপ্রদেশের গড় মুক্তেশ্বরে। একটি মেলায় সামান্য ঝগড়া থেকে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়ে পরে তা ভয়াবহ রূপ নেয় এবং মীরাট-গাজিয়াবাদ অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু তীর্থযাত্রীরা এই দাঙ্গায় যোগ দিয়ে মুসলমান হত্যা করেছিল। নারীদের ওপর অত্যাচার, শিশুদের আছড়ে মেরে ফেলার মতো নৃশংস ঘটনাও ছিল।[৫]

১। মহম্মদ আবদুর রহিম, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস', পৃ. ২৯৬

২। Sumit Sarkar, *Modern India*, p 433

৩। *Morning News*, Oct. 31, Nov. 1, 1946

৪। Quoted in Pyarelal, *Mahatma Gandhi*, pp 637-38

৫। The *Indian Annual Register*, Vol. II,1946, pp 214-15,
Sumit Sarker, *op cit*, p 434, M. A H Ispahani, *Qaid-i Azam Jinnah As I knew Him*, p 197

বিহারে কংগ্রেস সরকার দাঙ্গা-নিবারণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি, এমন অভিযোগ নোয়াখালিতে বসে গান্ধীকে বারবার শুনতে হয়। মুসলমানরা দাবি করেন, তাঁর উচিত বিহারে যাওয়া। গান্ধী সে অনুরোধ রক্ষা করেননি, কিন্তু তিনি স্বীকার করেন, বিহারে হিন্দুরা নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে। বিহারের ঘটনা অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদেরও কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের মনোভাবে তার কোন ছাপ পড়েনি।

কলকাতা দাঙ্গার দু সপ্তাহ পরে ২ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করল কংগ্রেস ২৪ অক্টোবর লীগও যোগ দিল সেই সরকারে। কংগ্রেস যখন সরকার গঠন করছে, কলকাতায় রক্তের দাগ তখনও মিলিয়ে যায়নি। লীগ যখন সরকারে যোগ দিচ্ছে, প্রায় ৫০ হাজার মানুষ তখনও বাস্তুচ্যুত হয়ে আছে বিহারে। নেহরু বড়লাটকে জানাচ্ছেন, কিছু করা দরকার; নোয়াখালির মানুষ আমাদের দিকে চেয়ে আছে;[১] দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বিহারে নিজে ছুটে যাচ্ছে নেহরু। তাঁর এ দায়িত্ববোধ কলকাতা দাঙ্গার সময় দেখা যায়নি; এখন দেখা যাচ্ছে, কারণ সরকারে বসে নেহরু প্রমাণ করতে চান, কংগ্রেসই ভারতের ভাগ্যবিধাতা।

কলকাতা দাঙ্গার জন্যে অনেক কঠিন সমালোচনা শুনতে হয়েছিল বাঙলার লীগ প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দিকে। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, এই দাঙ্গার পিছনে তার সরকারের বা দলের কোন হাত ছিল না। অথচ কলকাতা দাঙ্গার পর দু-মাস কাটতে না কাটতেই আবার দাঙ্গা শুরু হলো নোয়াখালিতে, কলকাতার মতো সে দাঙ্গাও মদত পেল লীগ সরকারের কাছ থেকে। সোহরাবর্দিকে স্বীকার করতে হল, নোয়াখালিতে হিন্দুদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করার কারণ আছে। অথচ লীগের আচরণে এরপরও কোন পরিবর্তন এল না; কলকাতায় বিচ্ছিন্নভাবে দাঙ্গা চলতেই লাগল। ৩ ডিসেম্বর গভর্নর বারোজ তাঁর গোপন নোটে লিখে জানালেন, মুসলমানরা এতটুকু অনুতপ্ত নয় বলা হচ্ছে, আরও বড় দাঙ্গা হতে পারে।[২]

লীগ যা চেয়েছিল সেই দাবি পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও যে সে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিল, তার কারণ লীগের তখন আর কিছু করার ছিল না। কলকাতা-নোয়াখালিতে এক প্রস্থ শক্তিপরীক্ষা তার হয়ে গেছে; আর তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। কলকাতায় হিন্দুরা সমান পালটা দিয়েছে; আর নোয়াখালির জবাব হয়েছে বিহার।

মানুষের জীবনকে বাজি রেখে শক্তিপরীক্ষায় নেমেছে দুই দল। তাই এত রক্তপাত, এত গণহত্যা, এত মানুষের গৃহচ্যুতি— কিন্তু কংগ্রেস-লীগ কারোর মনোভাবেই কোন পরিবর্তন নেই; কেউই তার জায়গা থেকে এক পা সরতে রাজি নয়। গান্ধীর মতো ব্যক্তিকেও বলতে শোনা যাচ্ছে, রক্তপাতের যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে তা-ই হবে : if India must have a bloodbath she had better have it now.[৩]

সাতচল্লিশের গোড়া থেকে এই দাঙ্গা-রক্তপাতকেই কাজে লাগানো হবে দেশ ভাগের অছিলা হিসেবে।

১। Mansergh, *op cit*, Vol III, p 783

২। *Ibid*, Vol. IX, p 250

৩। *Ibid*, Vol. III, p 774

বাঙলা ভাগের তরবারি : দাঙ্গা

কলকাতায় অন্তহীন হিংসা

নোয়াখালি দাঙ্গার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শত শত পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসেন কলকাতায়; শহরের মানুষ তাদের মুখ থেকে শোনেন পাশবিকতার আর হিংসার সেই মর্মান্তিক কাহিনী। কলকাতায় মুসলিম লীগ সরকারের মদতে তখনও বিচ্ছিন্নভাবে দাঙ্গা চলছে। ২৫ অক্টোবর কালীপুজোর একটি শোভাযাত্রার ওপর অ্যাসিড বালব ছোঁড়া হয়েছে; ২৬ তারিখে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বিভিন্ন হাঙ্গামার ঘটনায়; আহত ৭০। ২৮ তারিখে মৃত্যুর সংখ্যা ২২; কাশীপুরের বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে; অ্যাসিড বালব ছোঁড়া হয়েছে ট্রাম-লরি লক্ষ্য করে; প্রায় ৫০টির মতো নৌকো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে উত্তর-পূর্ব কলকাতার খালধারে। ২৯ অক্টোবর সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে উন্মত্ত জনতা। ছুরি-মারামারি, দোকান লুঠ, আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। কোন কোন অঞ্চলে হিন্দুরাও হামলা চালিয়েছে মুসলমান বস্তির ওপর। ২৭ অক্টোবর বালিগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে হত্যা করা হয়েছে কয়েকজন যাত্রীকে।[১]

অন্য দিকে হিন্দু পত্র-পত্রিকায় নোয়াখালি নিয়ে ক্রমাগত প্রচার চালানো হচ্ছে। 'হিন্দু' নামের একটি পত্রিকায় (৩১ অগাস্ট) কলকাতা দাঙ্গার পরই হিন্দু যুবকদের আহ্বান জানিয়ে লেখা হয়েছিল : 'হে বীর, অগ্রসর হও তোমার দেবস্থান মাতা কন্যা ও ভগ্নীর সম্মানরক্ষার্থে।' প্রচারের ভাষা আরও তীব্র হয়েছে নোয়াখালির ঘটনার পর। নগেন্দ্রনাথ দাস প্রকাশ করেছেন দুটি পুস্তিকা : 'নোয়াখালিতে আগুন জ্বলে, হিন্দুরা যায় রসাতলে' আর 'নোয়াখালির মর্মন্তুদ বিবরণ ও আমাদের কর্তব্য।' পুস্তিকা আরও প্রকাশিত হচ্ছে : 'রক্তের বদলে রক্ত চাই', 'এতদিন যাবৎ লীগ গুণ্ডারা'।[২] মুসলমান চরিত্র নিয়ে নাটক করা যাচ্ছে না। স্টার থিয়েটারে 'হায়দার আলী' বন্ধ হয়ে গেছে শিশির ভাদুড়ী 'আলমগীর' মঞ্চস্থ করার অনুমতি পাচ্ছেন না; মিনার্ভায় 'সীতারাম' বন্ধ কারণ ওই নাটকের একটি সংলাপে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বলা ছিল।[৩] বাঙলার হিন্দুদের মনে মুসলমানবিদ্বেষ প্রবল। পূর্ববঙ্গের কোন কোন শহরে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে বাঘনখের মতো এক ধরনের আত্মরক্ষার অস্ত্র জামার ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে;[৪] নিরাপত্তাহীনতার একটা বোধ বিশেষভাবে গ্রাস করেছে হিন্দু মনকে।

ক্ষোভ, বিদ্বেষ মুসলমানদের মধ্যেও। বিহারে ব্যাপক মুসলমান নিধনের কাহিনী

১। *The Statesman*, 26-30 Oct 1946. *Morning News*, 28 Oct

২। শিশির কর, 'ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই', পৃ. ৩২০

৩। 'বঙ্গশ্রী', অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

৪। মৌখিক সূত্র : মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়—তখন ফরিদপুরে স্কুলের ছাত্রী।

কলকাতায় এসে পৌঁছেছে; শহরের কোন কোন অঞ্চলে মুসলমান বস্তির ওপর হামলা চলছে; মুসলমানদের দোকান খুলতে দেওয়া হচ্ছে না; তাঁরা সাপ্তাহিক রেশন তুলতে পারছেন না;[১] উত্তর কলকাতায় হিন্দুরা তৈরি করে ফেলেছে প্রতিরোধ বাহিনী— 'রেজিস্টান্স গ্রুপ'। অস্ত্রশিক্ষার অনুশীলন চলছে তাদের মধ্যে।

এই পরিস্থিতিতে—পরস্পরের প্রতি বৈরিতা যখন দুই সম্প্রদায়ের মনেই প্রবল হয়ে উঠেছে—এল বাঙলা ভাগের দাবি। আনুষ্ঠানিকভাবে দাবিটি উঠল হিন্দু মহাসভার মঞ্চ থেকে; গলা মেলাল কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ; প্রত্যক্ষ মদত পাওয়া গেল হিন্দু ব্যবসায়ী আর পত্র-পত্রিকা গোষ্ঠীর তরফ থেকে। সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেস অবশ্য এর আগেই দেশভাগের কথা বলতে শুরু করেছিল। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার গোরক্ষপুর অধিবেশনে দেশভাগের দাবি তুলে 'স্বধর্ম রক্ষার কারণে রক্তস্নানের জন্যে' হিন্দুদের প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন এল. বি. ভোপটকর। মহাসভা এরপর ওই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে ফেলে;[২] চারমাস পরে সাতচল্লিশের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার তারকেশ্বর অধিবেশনে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশভাগকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে তুলে ধরেন। নির্মলচন্দ্র বলেন, হিন্দুদের কাছে এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন; 'বাঙলার হিন্দুরা জাতীয় সরকারের অধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করবে।' দিল্লীর একটি সভায় শ্যামাপ্রসাদ এমনও বলেন যে, পাকিস্তান যদি নাও হয়, তাহলেও বাঙলার হিন্দুদের জন্যে একটি আলাদা প্রদেশ চাই : Even if Pakistan is not conceded ... we shall demand the creation of a new province composed of the Hindu majority areas in Bengal.[৩] সাতচল্লিশের গোড়াতেও শ্যামাপ্রসাদ দেশভাগের কথা বলেননি; কিন্তু এখন তাঁর মনে হয়, দেশভাগ ছাড়া অন্য কোন সমাধান তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

তারকেশ্বর অধিবেশনে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ যোগ দেয়; বিপুল সমর্থন পায় দেশভাগের দাবি। নির্মলচন্দ্র যখন বলেন, ১৬ অগাস্টের ঘটনা তাঁর ভাবনা বদলে দিয়েছে, হিন্দুরা কথাটা মিলিয়ে নিতে পারেন নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে। কলকাতায় ইতিমধ্যে ২৫ মার্চ থেকে আবার বড়ো আকারে দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল। শহরের ২৫টি থানার মধ্যে ১৬টি তখন মুসলমান দারোগার অধীনে। কলকাতা দাঙ্গার পরই এক কুখ্যাত পাঞ্জাবী মুসলিম বাহিনী মোতায়েন করা হয়; এই বাহিনী এবং পুলিশ আগের মতোই পক্ষপাতী আচরণ চালিয়ে যাচ্ছিল; আর তার সঙ্গে ছিল জঙ্গি মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের দাপট। দাঙ্গা এই সময় কি রকম প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পাশের সারণীটি থেকে তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে। পূর্ব-মধ্য কলকাতা আর খিদিরপুর-একবালপুর-ওয়াটগঞ্জ ছিল নিয়মিত হাঙ্গামার জায়গা। বস্তির ওপর আক্রমণ, দোকানপাটে আগুন লাগানো আর খুনজখমের সঙ্গে ছিল যাত্রীবোঝাই বাস-লরির ওপর বোমা বা

১। *Morning News*, Oct. 14, 1946

২। *Modern Review*, Jan 1947

৩। অমলেন্দু দে, 'স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি', পৃ. ৩-৬

অ্যাসিড ছোঁড়া।[১] ২৫ এপ্রিল ক্যাপটেন পি. কে. সেনগুপ্ত নামে এক চিকিৎসককে তাঁর চেম্বারের মধ্যেই হত্যা করা হয়। অবস্থা রীতিমতো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এপ্রিলের শেষ দিকে। কম করে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল ২৪ এপ্রিল থেকে ৪ মে-র মধ্যে। ২৯ এপ্রিল গান্ধী-জিন্নাহর স্বাক্ষরিত শান্তি আবেদনের ৪০,০০০ ছাপানো কপি বিমান থেকে শহরের ওপর ফেলা হয়। ২৮ মে ছড়ানো হয় আরও ৩৫,০০০ প্রচারপত্র।[২]

দুষ্কৃতীদের পাশাপাশি পুলিসের অত্যাচারও এই সময় শহরবাসীর ত্রাসের কারণ হয়। ১২ এপ্রিল পুলিস মানিকতলার একটি বাড়িতে ঢুকে বাসিন্দাদের মারধোর করে। সাংঘাতিক জখম হন ছায়ালতা ঘোষ নামে এক গর্ভবতী নারী। ১৪ এপ্রিল পুলিস এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে বলে প্রচারিত হয়। ৮ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশ আর বম্বে থেকে ছুরিভর্তি ১৬৬টি পার্সেল জি. পি. ও-তে এসে পৌঁছেছে বলে প্রচারিত হলে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শহরে। 'মিউনিসিপ্যাল গেজেটে' (৫-২৬ এপ্রিল, ৩-৩১ মে) এই সময়কার দাঙ্গার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে :

তারিখ	মৃত	আহত
মার্চ		
২৭	৮	৪৬
২৮	১০	১০০
২৯	১৪	১০৪
৩০	৫	৬৬
৩১	—	৫০
এপ্রিল		
১	৪	৫৫
২	৩	৩৭
১৩	৪	১৫
১৪	১	৭
১৫	৩	১৩

সূত্র : 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট', ৫-২৬ এপ্রিল, ১৯৪৭

কলকাতার নাগরিক জীবন তখন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। টানা কারফিউ চলছে অঞ্চলে অঞ্চলে। দাঙ্গার পিছনে সরকারের মদত রয়েছে। হিন্দু পত্র-পত্রিকার ওপরও দমন-পীড়ন চলছে। এক বিশেষ অর্ডিন্যান্স বলে অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, আনন্দবাজার পত্রিকা, মডার্ন রিভিউ-এর ওপর জরিমানা ধার্য করা হয়; বাজেয়াপ্ত করা হয় জমা রাখা টাকা (ডিপোজিট)। ক্রমাগত দাঙ্গায় উৎপীড়িত হিন্দুর ক্ষোভ তাই একটা

১। *Modern Review*, April, 1947; N K Bose, *My Days with Gandhi*, pp231, 240

২। সাগর দত্ত লেনের নিমাইচাঁদ দত্ত জানিয়েছেন, তিনি বাড়ির ছাদে এরকম একটি প্রচারপত্র পেয়েছিলেন।

সমাধানের দিশা দেখতে পায় হিন্দু মহাসভার দাবিতে; হিন্দু পত্রপত্রিকাও প্রবলভাবে সমর্থন করে সে দাবি।

'অর্চনা' পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩৫৪) তারকেশ্বর অধিবেশনের ওপর একটা পূর্ণাঙ্গ লেখা ছাপে। 'মডার্ন রিভিউ' (মে, ১৯৪৭) মন্তব্য করে : 'দেশভাগ এখন একটা "গৃহীত সত্য" (accepted fact) হয়ে গেছে।' ডিসেম্বর মাসেই 'প্রবাসী' লিখেছিল : 'দুই সম্প্রদায়ের মিলনের আশা সুদূর পরাহত। ... বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব স্থিরভাবে বিচার করা প্রয়োজন হইয়াছে।' সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে এখন 'প্রবাসী'; 'শনিবারের চিঠি' (বৈশাখ, ১৩৫৪) পরিষ্কার লেখে : 'পৃথক হইয়া যাওয়াই ভাল।' হিন্দু পত্র-পত্রিকার প্রচারে হিন্দু মহাসভার দাবি প্রায় গণদাবির চেহারা নেয়। গ্যালপ পোলের ভেতর দিয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রমাণ করে দেয়, পাঠকদের ৯৮ শতাংশই বাঙলা ভাগ চায়; বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার জন্যে অমৃতবাজার পত্রিকা 'বেঙ্গল পার্টিশন ফান্ড' নামে একটা তহবিলই খুলে ফেলে।[১]

৪ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে হিন্দু মহাসভার দাবি সমর্থন করে। ২৬ এপ্রিল দুই কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায় এবং ডা. বিধানচন্দ্র রায় শ্যামাপ্রসাদকে জানান, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে তাঁরা বাঙলা ভাগের দাবি মেনে নেবার জন্যে অনুরোধ জানাবেন।[২] কলকাতা কর্পোরেশনের ৩A জন কাউন্সিলর একটি প্রস্তাবে দাবি করেন, 'বাংলার হিন্দু এবং জাতীয়তাবাদীদের জন্যে একটি আলাদা বাসভূমি চাই।'[৩] ২৩ এপ্রিল মহাসভার ডাকে হরতাল হয় কলকাতায়। 'হিন্দু যুবক পূর্ববঙ্গের অত্যাচারের প্রতিকার করো' নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয় এই সময়।[৪]

৩০ এপ্রিল কয়েকজন প্রভাবশালী হিন্দু শিল্পপতি এবং বণিকসভার প্রতিনিধিরা মিলে দাবি তোলেন, লীগের দাবি যেহেতু পাকিস্তান, বাঙলার হিন্দুরাও আলাদা প্রদেশ চাইবে অতএব হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে গঠন করা হোক ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত একটি আলাদা প্রদেশ: a separate province ... forming a part of the Indian Union. এই দাবি কার্যকর করার জন্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়; কমিটিতে থাকেন ডি. এন. সেন, ডি. সি. ড্রাইভার, বি. এম. বিড়লা, বি. এল. জালান, আর. সরকার, বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা প্রমুখ। বাঙলা ভাগের দাবিতে এই ব্যবসায়ীগোষ্ঠীকে আরও সরব হয়ে উঠতে দেখা যাবে পরে।[৫]

হিন্দুদের একটা বড় অংশ যে ক্রমে দেশভাগের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছেন, তার প্রধান কারণ : ক্রমাগত দাঙ্গা এবং দাঙ্গার পিছনে লীগ সরকারের মদত। কোন কোন অঞ্চলে হিন্দুদের তরফে আক্রমণ থাকলেও এই পর্যায়ের দাঙ্গাতেও আক্রমণকারী ছিল প্রধানত

১। Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p 227, *Amrita Bazar Patrika*, May 28, 1947

২। অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩। *Modern Review*, May 1947

৪। শিশির কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৫। *The Statesman*, May 1, 1947

মুসলমান দুষ্কৃতীরা এবং তাদের পিছনে ছিল পুলিস, বিশেষত পাঞ্জাবী মুসলিম বাহিনী। দাঙ্গা প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; আক্রান্ত হচ্ছিলেন সাধারণ নিরপরাধ মানুষও। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেই তাই হিন্দুরা সায় দিয়েছিলেন বাঙলা ভাগের দাবিতে। মে মাসে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় ভবানী সেন লিখেছিলেন, 'লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর দিক হইতে নাগরিক অধিকারের উপর বহুবিধ আক্রমণ হিন্দুদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের আকর্ষণ বৃদ্ধি' করেছে।[১] সরাসরিভাবে বাঙলা ভাগ সমর্থন না করলেও কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীও এই সময়, (৭ মে) 'একটি অ-সাম্প্রদায়িক সরকারের শাসনাধীনে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে একটি আলাদা প্রদেশের' দাবি তোলেন। বলা হয়, ক্রমাগত দাঙ্গার ফলে বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষা-শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মানুষের জীবন আর সম্পত্তির নিরাপত্তার স্বার্থেই প্রয়োজন একটি আলাদা প্রদেশ। প্রস্তাবে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।[২]

'স্বাধীন বঙ্গ' প্রস্তাব

বাঙলা ভাগের পক্ষে বিভিন্ন মহল থেকে যখন জনমত গড়ে উঠেছে, তখন তারই সমান্তরালে বঙ্গভঙ্গ রোধের একটি বিকল্প প্রস্তাবও এসেছিল। এই প্রস্তাবের পক্ষে একদিকে ছিলেন লীগ নেতা— সোহরাবর্দি আর আবুল হাশিম; অন্যদিকে প্রাক্তন কংগ্রেসী শরৎচন্দ্র বসু।

২৬/২৭ এপ্রিল নাগাদ সোহরাবর্দি প্রথম যে প্রস্তাবটি দেন, তাতে ভারত বিভক্ত হলেও বাঙলাকে একটি অখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়। সেই বাঙলা হবে : an independent undivided Sovereign Bengal in a divided India.[৩]

২০ মে শরৎ বসু এবং আবুল হাশিম স্বাক্ষরিত যে প্রস্তাবটি[৪] আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়, তাতে প্রাথমিক বয়ানের কিছুটা সংশোধন ছিল। স্বাধীন বঙ্গভূমির কথা থাকলেও বাঙলাকে সেখানে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে দেখানো হয়নি; বলা হয়েছিল, স্বাধীন বাঙলাই ঠিক করবে ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন হবে : Bengal will be a free state. The free state of Bengal will decide its relation with the rest of India. অন্যান্য শর্তগুলি ছিল : যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে আইন পরিষদ গঠন করা হবে এবং হিন্দু মুসলমানের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষিত থাকবে; তবে অন্তর্বর্তী সরকারে

১। ভবানী সেন, 'বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান', পৃ. ৪

২। *Calcutta Municipal Gazette*, 3-31, May 1947, p 453

৩। অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৪। বসু-হাশিম প্রাথমিক প্রস্তাবে বাঙলায় একটি 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' গঠনের কথা বলা হয়েছিল। ১৯ মে সেই আকারেই প্রস্তাবটি 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ২০ মে-র চূড়ান্ত বয়ানে দেখা যাচ্ছে, 'সার্বভৌম'-র সঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটিও বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা পরে দেখতে পাব, এই সংশোধনটি ছিল খুবই অর্থবহ।

হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা সমান হবে।[১] এই সংশোধিত প্রস্তাবে সোহরাবর্দিরও সমর্থন ছিল তিনিও ছিলেন এই প্রয়াসের একজন অত্যুৎসাহী উদ্যোক্তা।

প্রয়াসটি নানা কারণে ব্যর্থ হলেও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবে তার গুরুত্ব আছে; দ্বিতীয়ত এই প্রস্তাবটি নিয়ে কোন কোন বাঙালীর মনে আজও কিছুটা স্পর্শকাতরতা রয়ে গেছে। ব্যর্থতার কারণগুলি তাই একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, এই প্রস্তাবের অন্যতম প্রচারক সোহরাবর্দির সততা সম্পর্কে বাঙালী হিন্দুর মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সোহরাবর্দিকে এই সময় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, বাঙলার মহান ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে খুবই সরব হতে শোনা যায়। বাঙালী সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে তিনি বলেন, বাঙলা ভাগ হলে বাঙলার হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ক্ষতি; বিভক্ত বাঙলা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শোষণের শিকার হবে : Bengal divided will mean a Bengal prey to the people of other parts of India waiting to be exploited for their benefit.[২] কিন্তু এই জাতীয় আবেগময় কথায় বিশ্বাস করা বাঙালী হিন্দুদের পক্ষে অন্তত তখন সম্ভব ছিল না। কলকাতা দাঙ্গায় হিন্দুদের প্রতি লীগ সরকার কোন পক্ষপাতী আচরণ করেনি—সোহরাবর্দির এই উক্তির পিছনে এক তিল সত্যও ছিল না। তখনও কলকাতায় বিচ্ছিন্নভাবে দাঙ্গা চলছিল; এবং সেইসব দাঙ্গা লীগ সরকারের মদত পাচ্ছিল।

শরৎ বসু এবং আবুল হাশিমের বক্তব্যে অবশ্য যথেষ্ট সারবত্তা ছিল। শরৎ বসু ভারতকে একটি 'সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' (union of autonomous socialist republics) হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলেন; বাঙলা, তাঁর মতে, হবে এই রকমই একটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র। হাশিম বোঝান, বিদেশী পুঁজিপতি আর তার দেশী সাকরেদরা মিলে বাঙলা ভাগ করতে চাইছে; কারণ তারা জানে, বাঙলা বিভক্ত হলে ব্রিটিশ পুঁজির বিরুদ্ধে আর কোন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ থাকবে না।[৩]

কিন্তু সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বাঙলার সামাজিক-রাজনৈতিক বাতাবরণকে তখন এমনভাবে বিষিয়ে দিয়েছে যে, এই প্রস্তাবে তেমন সাড়া পাওয়া যায় না। লীগের মধ্যে আকরম খান প্রথমে সমর্থন জানিয়েও পরে সরে যান; কংগ্রেসের মধ্যে কিরণশঙ্কর রায় শরৎ বসুর সঙ্গে একমত হয়েছিলেন; কিন্তু পরে তিনিও কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের দিকেই ঝুঁকে যান।

ব্যক্তি হিসাবে কেউ কেউ স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। সংগঠনের দিক থেকে সমর্থন এসেছিল তফশিলভুক্ত জাতিবৃন্দের প্রতিনিধি যোগেন মণ্ডলের কাছ থেকে এবং কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে। বসু-হাশিম প্রস্তাব সমর্থন করে ভবানী সেন লেখেন, 'কংগ্রেস ও লীগের চুক্তির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ বাংলা ব্রিটিশ পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দিবে।' কমিউনিস্টরা দাবি করেন : a United and Free Bengal within a Free India.[৪] ১ জুন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় লেখা হয় : 'বঙ্গভঙ্গ রোধ করুন। ঐক্যবদ্ধ ভারতে স্বাধীন বাংলা গড়ুন।'

১। Abul Hashim, In Retrospection, pp 153-54; অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৯

২। অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৫, ২০

৩। ঐ, পৃ. ২৩, ২৭

৪। ঐ, পৃ. ৮৭-৮৯; ভবানী সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

অন্যদিকে স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ আসে হিন্দু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং হিন্দু পত্র-পত্রিকাগুলির তরফ থেকে। ৩০ এপ্রিলের পূর্বোক্ত সভায় বণিকসভার প্রতিনিধিরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন : The economic development of the province ... makes it imperative for Bengal to remain attached to an Indian Union....

বাঙলার অর্থনৈতিক বিকাশের দোহাই দিয়ে ব্যবসায়ীরা আসলে বলতে চান নিজেদের বিকাশের কথাই। যুক্তবঙ্গে মুসলমান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা থাকবে; সে সম্ভাবনা নির্মূল করে বিদায়ী ব্রিটিশ পুঁজির ওপর একচেটিয়া হিন্দু আধিপত্য কায়েম করার জন্যেই তাদের দরকার ছিল বাঙলা-ভাগ এবং স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা।

হিন্দু পত্র-পত্রিকাগুলি এদের বাহন হয়ে স্বাধীন-বঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রচার চালায়। 'মডার্ন রিভিউ' (মে ১৯৪৭) লেখে, সোহরাবর্দির 'উর্বর মস্তিষ্কের' (agile brains) ফসল এই পরিকল্পনা। তুষারকান্তি ঘোষ, মাখন সেন প্রমুখ পত্রিকা-সম্পাদকের উদ্যোগে অঞ্চলে অঞ্চলে বঙ্গবিভাগের সমর্থনে জনসভা করা হয়। প্রকাশিত হয় 'বাংলার হিন্দুরা সাবধান' নামে একটি পুস্তিকাও।

হিন্দু পত্রিকার মধ্যে 'বঙ্গশ্রী', 'হিন্দু', এবং 'স্বরাজ' বাঙলা ভাগের বিরোধিতা করেছিল। তারকেশ্বর অধিবেশনকে ব্যঙ্গ করে 'বঙ্গশ্রী' লিখেছিল (বৈশাখ ১৩৫৪), ওই অধিবেশন হলো 'উকিল-ব্যারিষ্টার চাটুজ্জে-মুখুজ্জে-অধ্যুষিত ব্রাহ্মণ সভা।' তবে লীগ নেতৃত্বের, বিশেষ করে সোহরাবর্দির আন্তরিকতায় 'বঙ্গশ্রী'-রও সন্দেহ ছিল। অখিল দত্ত, সত্য বক্সী, প্রমুখ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতাও ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন।

গ্রামাঞ্চলেও সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রবল ছিল। মুসলমান চাষিদের হাতে পাবার জন্যে লীগ মন্ত্রীসভা জানুয়ারি মাসে একটি বর্গাদার বিল এনেছিল। হিন্দু জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে ঘা লাগে তাতে; দুই সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থই বাঙলা ভাগের পক্ষে-বিপক্ষে প্রচার চালায়। অবশ্যই তার পাশাপাশি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে আছে ময়মনসিংহে লাল পতাকা হাতে নিয়ে বাঙলা ভাগের বিরুদ্ধে হাজং চাষিদের মিছিল; রংপুরের একটি সভার ধ্বনি : 'দাঙ্গা করে মরব না, বাংলা ভাগ করব না।'[১] আরও কয়েকটি অঞ্চলেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সভা হয়। দুঃখের বিষয়, এই দাবি গণদাবি হয়ে উঠতে পারেনি। মুসলমান পত্র-পত্রিকাগুলির দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সময় একটা দু-মুখো ভাব লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ প্রায় গোড়া থেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছেন। জিন্নাহ্ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবকে বর্ণনা করেন পারস্পরিক ঘৃণা আর তিক্ততাজাত এক কুচক্রী পরিকল্পনা বলে : a sinister move actuated by spite and bitterness. আকরম খান দাবি তোলেন, অবিভক্ত বাঙলা আর পাঞ্জাবকে নিয়েই গঠিত হবে পাকিস্তান। লাহোরের এক মসজিদে বাঙলা আর পাঞ্জাব ভাগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়। সারা ভারত মুসলিম লীগ অভিযোগ করে, মুসলমানদের রাজনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার এক 'বর্ণহিন্দু চক্রান্ত' হলো বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব। মুসলমান ব্যবসায়ীদের প্রভূত ক্ষতি হবে এর ফলে।[২]

কিন্তু মুসলমান ব্যবসায়ীগোষ্ঠীগুলি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল এবং বসু-হাশিম প্রস্তাবকে তারা ভালো চোখে দেখেনি। ইস্পাহানী গোষ্ঠীর কাগজ 'মর্নিং নিউজ' এবং 'স্টার অফ

১। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, 'উত্তাল চল্লিশ: অসমাপ্ত বিপ্লব', পৃ. ২৩২-৩৪

২। *Morning News*, May 1, 5, 6, 1947

ইণ্ডিয়া' ১৩ মে-র সম্পাদকীয়তে 'মুসলমানদের দাসত্বে নিক্ষেপের হিন্দু ষড়যন্ত্রের' বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয় পাঠকদের। স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাব ব্যর্থ হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে 'মর্নিং নিউজ' মন্তব্য করে : (Muslims) have at last been freed from the incubus of a hostile minority.[১] এইসব ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর সঙ্গে লীগের সোহরাবর্দি গোষ্ঠীর কিছু বিরোধ ছিল। দ্বিতীয়ত, মুসলিম ব্যবসায়ীরা জানত, যুক্তবঙ্গে তারা প্রতিযোগিতায় হিন্দুদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। কলকাতার দাবি ছেড়ে দিলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে মোটা টাকা পাওয়া যাবে, এমন আশাও তাদের ছিল।[২]

এইসব কারণেই মুসলিম ব্যবসায়ীরা বসু-হাশিম পরিকল্পনায় সম্মতি দেয়নি এবং লীগের মধ্যে তাদের প্রভাব খাটিয়ে ক্রমে তারা লীগ নেতৃত্বের একটা বড় অংশকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে রাজি করাতে সক্ষম হয়। আকরম খান প্রথমে সোহরাবর্দিকে সমর্থন করেও পরে সরে যান। বিরোধী এই গোষ্ঠীটি হাশিমের স্বাধীন-বঙ্গ উদ্যোগের অধিকার এবং বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মত দেয়, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার এক্তিয়ার আছে কেবল সারা ভারত মুসলিম লীগের। মুসলিম ছাত্রসমাজের একটা অংশও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।[৩] তবে 'মিল্লাৎ' পত্রিকা স্বাধীন-বঙ্গের পক্ষে ছিল।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে লীগ একটা স্তর পর্যন্ত সমর্থন করলেও, পাকিস্তান দাবি তারা কখনও ছাড়েনি। বরং তাদের কাছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার অর্থ ছিল বাঙলাকেও পাকিস্তানের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া। বাঙলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে চাওয়া হয়েছিল প্রধানত কলকাতাকে পাওয়ার জন্যে এবং চটশিল্পের কথা ভেবেও। জিন্নাহ্ এক সময় বলেই ফেলেন, কলকাতাকে না পেলে বাঙলার কি লাভ?—What is the use of Bengal without Cacutta?[৪] সোহরাবর্দির বক্তব্য আরও পরিষ্কার : তিনি বাঙলা ভাগ চান না; কারণ তাহলে হিন্দুরা 'কলকাতার লোভনীয় উপহারটি' (the rich prize of Calcutta) পেয়ে যাবে আর ক্ষতি হবে মুসলমানদের। আর এক লীগ নেতা মহম্মদ উসমানের কথায়, বাঙলা ভাগ হলে চটকলগুলো সব থেকে যাবে পশ্চিম বাঙলায়, লাভ হবে কেবল গুটিকয় ব্রিটিশ আর হিন্দু পুঁজিপতির।[৫]

চটশিল্প নিয়ে হিন্দু মুসলমান ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের যে উদ্বেগ, তার পিছনে কাজ করছে আসলে দুই সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িক স্বার্থ। সস্তা শ্রম ভাড়া করে কম টাকা খাটিয়ে প্রচুর মুনাফালাভের ক্ষেত্র ছিল চট। সেটা জেনেই মাড়োয়ারিরা হাত বাড়িয়েছিল এই শিল্পে; আবার পাটচাষ-প্রধান পূর্ববঙ্গের মুসলমান ব্যবসায়ীদের স্বার্থও জড়ানো ছিল এর সঙ্গে; ছিল ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থও। চটশিল্পের স্বার্থকে কেন্দ্র করেই তাই দেখা যায় গড়ে উঠেছে বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তিবিন্যাস এবং সব পক্ষই এই শিল্পটির জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

১। *Ibid*, June 21, 1947

২। আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', পৃ. ২৬২

৩। *Morning News*, May 14, 29, 1947

৪। Quoted in Harun-or Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*, pp 292-93

৫। *Morning News*, May 8, 24, 1947

যুক্তির এপিঠ ওপিঠ

আবুল হাশিমের যুক্তি ছিল, ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থেই দেশভাগ করতে চাইছে কারণ তারা জানে, যুক্তবঙ্গে তাদের আধিপত্য তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে।[১] হাশিমের এই যুক্তি খুবই তাৎপর্যময়; কিন্তু বাঙলার অর্থনৈতিক মানচিত্রটি, বিশেষত তার ব্যবসায়িক সংস্থানটি, এর আগেই বদলাতে শুরু করেছে। ব্রিটিশ পুঁজির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে যে হিন্দু পুঁজিপতি গোষ্ঠী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই একের পর এক ব্রিটিশ পুঁজির শেয়ার কিনে তারা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। এ অবস্থায় ব্রিটিশ পুঁজির আর খুব আগ্রহ থাকার কথা নয়। অন্যদিকে হিন্দু পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থেই চাইবে বাঙলা-ভাগ, যাতে বিদায়ী ব্রিটিশ পুঁজির প্রায়-সবটাই কুক্ষিগত করে নিতে পারে তারা। আবার এই কারণেই মুসলমান ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পক্ষে যুক্তবঙ্গের প্রস্তাবে আগ্রহী হওয়া সম্ভব নয় কারণ তারা জানে, যুক্তবঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা হিন্দু পুঁজিপতিদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।[২] স্বাধীন বঙ্গের প্রস্তাবকে এক লীগ নেতা তাই বর্ণনা করেন 'পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী' প্রস্তাব বলে।[৩]

হিন্দু কায়েমী স্বার্থ কেন বাঙলা ভাগ চেয়েছিল, মুসলমান কায়েমী স্বার্থ কেন স্বাধীন-বঙ্গ প্রস্তাবে সায় দেয়নি, তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এখান থেকে পাওয়া যায়। হিন্দু ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। ১৯৪৮-এর মধ্যেই বাঙলায় মাড়োয়ারিরা শতকরা ৮৫ ভাগ চটশিল্পে ডিরেক্টর হয়ে বসে; কয়লা শিল্পে, জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকে ৬১ শতাংশ।[৪] মুসলমান ব্যবসায়ীরা এটা আঁচ করেই বাঙলা-ভাগের পক্ষে মত দিয়েছিল; বাঙলা-ভাগ ঘোষিত হওয়ার পরই তাই দেখা যায়, মুসলমান ব্যবসায়ীদের একাংশ, বিশেষত চামড়ার কারবারীরা ব্যবসা উঠিয়ে নিয়ে ঢাকায় চলে যাচ্ছে।[৫]

হাশিমের যুক্তির জবাবে শ্যামাপ্রসাদ[৬] বলেছিলেন, স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাবের পিছনে আসলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের মদত আছে। বাঙলা ভাগ হলে পাটচাষের এলাকাগুলো চলে যাবে পূর্ববঙ্গে; অথচ চটকলগুলো থাকবে পশ্চিমবঙ্গে। চটশিল্পের প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাবে এর ফলে; আর এই ক্ষতি রোধ করার জন্যেই ব্রিটিশ দেশভাগ আটকাতে চায়। হিন্দু কায়েমী স্বার্থের পক্ষে হলেও শ্যামাপ্রসাদের এই যুক্তি একেবারে অগ্রাহ্য করার নয়। চটশিল্পে ইতিমধ্যে হাত বদল শুরু হয়ে গেলেও ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থটা কিছুদিন পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মনে হয়।

১। অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২। 'For the League's business supporters this meant the supremacy of the Tatas, the Birlas and the Dalmias in the competitive wilds of an independent India.' (Ayesha Jalal, op it, pp 210-11)

৩। *Morning News*, May 13, 1947

৪। Omkar Goswami, *'From Traders to Capitalists Marwaris of Calcutta'*, *The Sunday Statesman*, January 12, 1986

৫। *Amrita Bazar Patrika*, June 11, 1947

৬। N K Bose, *op cit*, p 233

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অসমাপ্ত চটাব্দ' উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, সাতচল্লিশের গোড়াতেও চটশিল্পে শ্রমিকদের মধ্যে বলাবলি হতো, বাঙলা-ভাগ হচ্ছে না—ব্রিটিশই তা ঠেকিয়ে দেবে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই রটে যায়, বাঙলা-ভাগ হচ্ছে; কলগুলো সব মাড়োয়ারিরা কিনে নেবে।[১] ব্রিটিশ একটা পর্যায় পর্যন্ত চটশিল্পে তার পুঁজিটা ধরে রাখতে চেয়েছিল, এমন একটা ইঙ্গিত এ থেকে পাওয়া যায়। সরকারের গোপন রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, মে মাসে স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন লিখছেন, মিলগুলো সব পূর্ববঙ্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হোক।[২] পূর্ববঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজির নিরাপত্তার একটা আশ্বাস সম্ভবত ব্রিটিশ সোহরাবর্দির কাছ থেকে পেয়েছিল। এপ্রিলে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে যুক্তবঙ্গের আর্জি সোহরাবর্দি যে ভাষায় পেশ করেন, তা বেশ খেয়াল করার মতো। পাকিস্তান কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হবে, এই আশ্বাস দেওয়ার পর সোহরাবর্দির সানুনয় প্রার্থনা: ব্রিটিশ যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব মেনে নিক; কি করেছি আমরা যে আমাদের পদাঘাত করা হচ্ছে—I do not see how you kick us out! What have we done to be expelled ![৩]

স্বাধীন এবং যুক্তবঙ্গের জন্যে সোহরাবর্দির এই যে মিনতি, এর আসল উদ্দেশ্য হল কলকাতাসহ বাঙলাকে নিয়ে একটি মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্র করে তোলা। লক্ষণীয়, বসু-হাশিম প্রস্তাবে সার্বভৌম বঙ্গের কথা না থাকলেও মুসলিম লীগ বরাবরই স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার দাবি জানিয়ে এসেছে। স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাওয়ার পর সোহরাবর্দির প্রথম খোদোক্তিই ছিল : 'স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার পিঠে ছুরি মারা হয়েছে।' স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার নামে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের চিন্তাই সোহরাবর্দির মাথায় প্রথম থেকে ছিল;এবং এই রাষ্ট্রকে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ব্রিটিশ পুঁজির সহায়তায়। এ ব্যাপারে গভর্নর বারোজের সঙ্গে তাঁর কিছু চুক্তি হয়ে থাকাও সম্ভব। স্বাধীন বঙ্গের হয়ে বারোজ যেভাবে সালিশী করেন, তা থেকেও এই সন্দেহ দৃঢ় হয়। ২৮ মে মাউন্টব্যাটেনকে লেখা গোপন নোটে বারোজ বলেন, যুক্তভঙ্গই সবচেয়ে ভালো প্রস্তাব;তা না হলে পূর্ববঙ্গের ক্ষতি হয়ে যাবে : Partition is politically and economically a deplorable prospect especially for Eastern Bengal।[৪] পূর্ববঙ্গের জন্যে বারোজের এই দরদের পিছনে সোহরাবর্দির সঙ্গে তাঁর কোন চুক্তির ব্যাপারও থাকতে পারে। এই বারোজের নির্দেশেই সোহরাবর্দি বসু-হাশিম প্রস্তাবে বাঙলার নামের আগে বসানো 'সমাজতান্ত্রিক' অভিধাটি কেটে দেবার জন্যে সুপারিশ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তা-ই করা হয়।[৫] বাঙলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেবার একটা চেষ্টা ব্রিটিশের দিক থেকেও ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যেই বারোজকে গভর্নর করে পাঠানো হয়েছিল বাঙলায়, এমন একটা ইঙ্গিত প্রাক্তন আই সি এস অশোক মিত্রের লেখাতেও পাওয়া যায়।[৬]

১। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'অসমাপ্ত চটাব্দ' পৃ. ৮২-৮৬

২। *The Transfer of Power*, ed. by N Mansergh, Vol X, pp 554, 585

৩। *Ibid*. p 449

৪। *Ibid*. Vol IX, p 1025, Rashid, op cit, p 311

৫। Rashid, *op cit*, p 311

৬। অশোক মিত্রের রচনা, 'চতুরঙ্গ', জানুয়ারি ১৯৯০

হিন্দু কায়েমী স্বার্থের উদ্যোগে বাঙলা-ভাগের আন্দোলন আর মুসলমান কায়েমী স্বার্থের তরফ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ—স্বার্থ-সংঘাতে দীর্ণ এই পরিস্থিতিতে দাঙ্গা হয়ে ওঠে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়; নিজেদের স্বার্থকে জনগণের স্বার্থ হিসাবে প্রচারের উদ্দেশ্য দুই সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থই দাঙ্গাকে ব্যবহার করে হাতিয়ার হিসাবে।

ক্ষণিকের উত্তেজনা নয়, ছকে-ফেলা হত্যাকাণ্ড

মার্চ মাসের দাঙ্গাতেও আক্রমণকারীর ভূমিকা ছিল প্রধানত মুসলমানদের। কিন্তু স্বাধীন বঙ্গ দাবি ওঠার পর হিন্দুদের ভূমিকাও সমান আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। লেঠেল বাহিনী তৈরি হয়; উত্তেজক প্রচারপত্র ছড়িয়ে হিন্দুদের তাতিয়ে তোলা হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে। নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটির একটি বিবৃতিতে কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে লেখা হয়, কোন কোন অঞ্চলে পুলিস আর গুণ্ডারা বস্তিবাসীর ওপর হামলা চালাচ্ছে।[১] 'মর্নিং নিউজ' এই দাঙ্গার জন্যে দায়ী করে প্রধানত কংগ্রেসকে। বলা হয়, কংগ্রেস গুণ্ডাদের উসকানি দিচ্ছে। এ অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল না। হিন্দু মহাসভা-কংগ্রেস মিলে উগ্র মুসলমান বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল এই সময়। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ 'ক্ষমতা দখলের জন্যে তৈরি থাকার' নির্দেশ দিচ্ছিলেন তাঁর দলের ক্যাডারদের।[২]

অন্যদিকে মুসলিম লীগ হাত গুটিয়ে ছিল না। ১২ মে 'মর্নিং নিউজে'ই পাওয়া যাচ্ছে, লীগ নেতা সিদ্দিক আলী মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডকে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হবার নির্দেশ দিচ্ছেন; মুসলমান যুবসমাজকে আহ্বান জানাচ্ছেন ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দেবার জন্যে।[৩] সালার-ই সুবা নামে একটি জঙ্গি মুসলমান সংগঠন কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানাচ্ছে, প্রস্তাব না মানলে দেখে নেওয়া হবে; পিস্তলে গুলি ভরা আছে : The loaded pistol is ready।[৪]

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এক ভয়াবহ চেহারা নেয় এই সময়। দুই দলই গুণ্ডাবাহিনী মজুত রেখেছে; দুই দলই মরিয়া; ফল দাঁড়াচ্ছে : প্রতিদিনই কিছু না কিছু দাঙ্গা ঘটে যাচ্ছে কলকাতায়। হাঙ্গামার আশঙ্কায় কলকাতা ময়দানে ফুটবল লীগ বন্ধ। উপদ্রুত অঞ্চলে কারফিউ; বিপর্যস্ত নাগরিক জীবন। ১৯ মে স্বাধীন-বঙ্গ প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করার আগের দিনই ১৭টি মারদাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে কলকাতায়। ২৩ মে বিচ্ছিন্ন কিছু হাঙ্গামা। ২৭ মে বড়তলায় দাঙ্গা, কারফিউ জারি হয়েছে। ২৪ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত সময়ে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল দাঙ্গায়, ১৯-২৮ মে মৃত্যুর সংখ্যা ৪০।[৫] মুসলিম লীগের যে অংশ

১। *Morning News*, April 5-6, May 3, 1947

২। *Ibid*, May 3, 1947

৩। এই সময় মুসলিম লীগের একটি স্লোগান ছিল : '*হাঁসকে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।*' (মৌখিক সূত্র : অরুণ বসু)

৪। *Ibid*, May 12, 1947; Shila Sen, *op cit*, pp 241-42

৫। *Morning News*, May 20, 24,28, 1947; *Calcutta Municipal Gazette*, 3-31 May 1947. pp 455-64

স্বাধীন বঙ্গ চায়, তারা যেমন কংগ্রেসকে হুমকি দিচ্ছে, যে অংশ চায় না, তারাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগাচ্ছে নিজেদের ক্ষমতা দেখানোর জন্যে। অন্যদিকে কংগ্রেস শুধু স্বাধীন বঙ্গ প্রয়াসের বিরোধিতা করেই থেমে নেই; এই প্রয়াসকে বানচাল করে দেবার জন্যে গোটা মে মাস জুড়ে দাঙ্গা চালিয়ে গেছে তারা। হিন্দু মহাসভা হুমকি দিয়েছে : 'প্রতিটি হিন্দু মহল্লাকে আমরা দুর্গ করে তুলব।'[১] বিজয় সিং নাহারের কথায়, ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পর হিন্দু যুবকদের নিয়ে উত্তর কলকাতায় তিনি যে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করেন, সেই বাহিনীকে স্বাধীন বঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ব্যবহার করা হয় এবং যুবকদের একাংশ দাঙ্গা-হাঙ্গামা গুণ্ডামিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেয়। গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য : প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে প্রচুর অস্ত্র এসেছিল; অস্ত্র পাওয়া কঠিন ছিল না; 'সোলজারদের এক বোতল হুইস্কি দিলে একটা পিস্তল আর ২০০ কার্তুজ পাওয়া যেত।'[২]

দাঙ্গা-হাঙ্গামার সঙ্গে ব্যাপক প্যানিকও ছড়ানো হয়; অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে সভা চলতে থাকে। ৩০ মে তালতলা, জোড়াসাঁকো, বড়বাজার অঞ্চলে বড় রকমের দাঙ্গায় ৬ জনের মৃত্যু হয়; আহত ৬০। ৩১ মে বেতার ভাষণে গভর্নর স্বীকার করেন, কলকাতায় দু-মাস ধরে টানা দাঙ্গা চলছে। ৩ জুন সন্ধ্যায় বড়লাট দেশভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১০ জুন সারা ভারত মুসলিম লীগ এবং ১৩ জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় বিভক্ত বঙ্গে হিন্দুদের বেশি জমি দিতে হবে।[৩] কলকাতায় প্যানিক ছড়ানো এবং বিচ্ছিন্নভাবে দাঙ্গা চলতেই থাকে; আর এই পরিস্থিতিতেই বাঙলার প্রাদেশিক আইন পরিষদে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব পাশ হয়ে যায় ২০ জুন। পরের দিন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র সংবাদ শিরোনামে লাল রঙের সেই মাপের টাইপ ব্যবহার করা হয়, যে টাইপ ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্টও দেখা যাবে। বঙ্গভঙ্গ এদের কাছে কতটা জরুরি ছিল, এই ঘটনাটি তার কিছুটা ইঙ্গিত দেয়।

অবশ্য গোটা ব্যাপারটাই যে কেবল স্বার্থান্বেষীদের প্রচারের ফল, এটা মনে করা ঠিক হবে না। দেশভাগের দাবির পিছনে জনসমর্থন ছিল আর তাদের মনকে সেইভাবে তৈরি করে দেবার কাজেই হাতিয়ার হয়েছিল দাঙ্গা। এপ্রিলের শেষদিকেই 'স্টেট্‌সম্যান' লিখেছিল : Politically minded Hindus ... have become so embittered that nothing less than a division of the Province will content them।[৪] এরপর দাঙ্গা আরও প্রবল হয়; সাধারণ মানুষের তিক্ততাও আরও বাড়ে। কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকার করে, 'হিন্দু মহাসভার হিন্দু জাতীয়তাবাদই আজ বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্তের মন আচ্ছন্ন করিয়াছে।[৫] ৩ জুন বেতারে বড়লাট দেশভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। রাস্তার মোড়ে মাইক বসিয়ে সাড়ম্বরে প্রচার করা হল সে ঘোষণা; জনতা শুনে হর্ষধ্বনি করে উঠল।[৬]

১। Rashid, *op cit*, p 320

২। বিজয় সিং নাহারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ; গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

৩। *Amrita Bazar Patrika*, May 28, June 1, 1947

৪ *The Statesman*, April 24, 1947

৫। ভবানী সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৬। সতীশ পাকড়াশী, 'অগ্নিযুগের কথা' (পরিশিষ্ট অংশ), পৃ. ১৮৪

ক্রমাগত দাঙ্গায় ত্রস্ত, বিপর্যস্ত মানুষ; এতটাই গ্রহণীয় হয়ে উঠল তাই তাদের কাছে দেশভাগ।

শুধু শহরের মানুষ নয়, গ্রামাঞ্চলেও মানুষের মনও ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল দেশভাগের জন্য। নিরাপত্তাহীনতার একটা বোধ গ্রাস করেছিল তাদের। দুঁদে ব্রিটিশ সরকারও যখন দাঙ্গা ঠেকাতে পারল না, তখন নিজেরাই ভাগাভাগি করে নিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ স্থির করে নেওয়া ভালো—এরকম একটা চেতনাও সম্ভবত তাদের মধ্যে কাজ করেছিল। সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের মনও। মুসলমান চাষির চেতনায় দেশভাগের অর্থ দাঁড়িয়েছিল হিন্দু জমিদারের পীড়ন থেকে মুক্তি। হিন্দু মধ্যবিত্তের কাছে দেশভাগ মানে দাঙ্গার অবসান—জীবন আর সম্পত্তির নিরাপত্তা।

এটা ঠিক যে, ১৯৪৬-এর শেষদিক থেকেই উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলমান একজোট হয়ে ভাগচাষির অধিকারের দাবি তোলে—সেটা নিঃসন্দেহে স্মরণে রাখার মতো ঘটনা। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন নির্দিষ্ট কয়েকটা অঞ্চলের বাইরে ছড়াতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে প্রচার করে। কোন কোন অঞ্চলে যেমন, কাঁচরাপাড়ায় তেভাগা আন্দোলনের কর্মীরাই গ্রাম থেকে এসে দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল;গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান কৃষকের হাতে হাত ধরে লাল পতাকা নিয়ে মিছিলের ঘটনাও আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ধারাটা খুব বেশি দূর ছড়াতে পারেনি; কারণ তেভাগা আন্দোলনকে কোন্ স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, তা নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল।

আন্দোলনের অন্যতম নেতা অবনী লাহিড়ীর কথায়, '১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর কমিউনিস্ট পার্টির একটা অংশ ভাবল, আর কিছু করা যাবে না। উদ্যোগ-ভার কংগ্রেস ও লীগের হাতে চলে গেছে।' তেভাগা আন্দোলনকে বৃহত্তর গণ-জাগরণের স্তরে নিয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ রচনা সম্ভব ছিল, কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অন্তর্গত দ্বিধার কারণে তা সম্ভব হয়নি। আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ অশোক বোসের ভাষায়, 'সেদিনের নেতৃত্বের তেমন কোন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। আন্দোলনের বিস্তার, তার বিপ্লবী জোয়ার দেখার পরও তারা দরিদ্রতম অংশকে উপেক্ষা করল, নেতৃত্বে বহাল রাখল জনগণের ধনীতর অংশকে, কখনো বা নির্লজ্জ সুবিধাবাদীদের।' চল্লিশের দশকের আর এক কমিউনিস্ট নেতা অরুণ বসুও স্পষ্টভাবে লিখেছেন, তেভাগা আন্দোলন কোনদিনই লীগ সরকারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারেনি, চাষিদের ওপর লীগ সরকারের নিপীড়ন সত্ত্বেও না।[১]

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দাঙ্গা বাধিয়ে সাধারণ মানুষকে তার মধ্যে টেনে এনে, তাদের ত্রস্ত বিপর্যস্ত করে দিয়ে, তাদেরই মুখ দিয়ে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক একটা দাবি

১। 'বর্তিকা' (পত্রিকা), বিশেষ তেভাগা সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১৭৬-৭৭;
ঐ, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১২২; Arun Bose, 'From Self Determination to Voluntary Union' (unpublished paper)

তুলিয়ে নেওয়ার এই যে কূট প্রক্রিয়া—হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থই সমানভাবে কাজে লাগিয়েছিল একে; ব্রিটিশেরও তা জানা ছিল; কিন্তু নিজের স্বার্থেই সে বাধা দেয়নি এই প্রক্রিয়ায়।

১১ মে-র 'টপ সিক্রেট' নোটে গভর্নর বারোজ জানান, কলকাতাকে বাদ দিয়ে পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্র হলে রণক্ষেত্র হয়ে যাবে। ২৮ মে বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে আবার লেখেন, বাঙলা ভাগ হলে ব্যাপক হাঙ্গামার আশঙ্কা রয়েছে। বারোজ এই সময় যুক্তবঙ্গের হয়ে সালিশী করতে থাকেন। বাঙলার অবস্থা, বারোজ বলেন, 'অত্যন্ত উত্তপ্ত' (super-heated and explosive) হয়ে উঠেছে। বাঙলা ভাগ হলে মুসলমানরা ব্যাপক দাঙ্গা বাধাবে : 'Muslims will ... adopt every form of resistance in course of which much blood will be shed and much property devastated especially in Calcutta।' অপর পক্ষও তৈরি আছে—planned campaign of violence—হিংসাত্মক পরিকল্পনা নিয়ে; দু পক্ষই প্রচুর অস্ত্র, বোমা মজুত রেখেছে; হিংসাত্মক প্রস্তুতি এক অভূতপূর্ব চেহারা নিয়েছে : 'both sides have bombs and other weapons to an extent hitherto not experienced in communal disturbances in Bengal।'[১]

এত ধরনের পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও দাঙ্গা ঠেকানোর জন্যে যে তেমন কোন প্রস্তুতি ছিল না, তার কারণ ব্রিটিশ তখন আর হাঙ্গামায় জড়াতে চায়নি; ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত তার আগেই নেওয়া হয়ে গেছে; দেশভাগ করে জোড়াতালি দিয়ে দুটো সরকার বসিয়ে তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে এই হাঙ্গামা থেকে কেটে বেরিয়ে যেতেই সে তখন ব্যগ্র। গণ-অসন্তোষ বাড়ছে। দাঙ্গা ঘটেই চলেছে; লোকের মনে ইংরেজ বিদ্বেষও প্রবল। মার্চ মাসেই কলকাতার ইংরেজরা জানিয়ে দিয়েছে, তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। শ্রমিকদের অনেক সময় মালিকদের ওপর শারীরিক আক্রমণ চালাতে প্ররোচিত করা হচ্ছে এ ছাড়া 'ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা' (growing communal tension) তো আছেই।[২] ব্রিটিশ তাই আর খুব বেশি দেরি করতে রাজি নয়। কংগ্রেস লীগের সংঘর্ষের মধ্যেও সে নিজেকে জড়াতে চায় না; পৃথিবীর কাছে সে দেখাতে চায়, ক্ষমতা হস্তান্তর কিভাবে হবে তা নির্ধারণের ভার ভারতবাসীর হাতেই যথাসম্ভব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২৪ এপ্রিলের 'টপ সিক্রেট' নোটে গভর্নর লিখছেন : দেশভাগের ব্যাপারে যেটুকু না করলে নয়, তার বেশি কোন উদ্যোগ ব্রিটিশ নেবে না : the minimum of partition should be settled under the aegis of the British। এ দায়িত্ব ভারতবাসীর ঘাড়েই তুলে দেওয়া হবে : We should as soon as possible put the resposibility ... squarely on the Indian soldiers।[৩]

তাই দেশভাগ স্থির হয়ে যাওয়ার পরও জুন মাসের শেষদিক থেকে আবার যে নতুন করে দাঙ্গা শুরু হল, তা যেন বিধিনির্দিষ্ট নিয়তির মতো। সকলেরই জানা আছে, দাঙ্গা হবে এবং তাই-ই ঘটছে। অতএব দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্যে কারোরই কোন দায়িত্ব নেই।

১। Mansergh. *op cit*. Vol X, pp 772, 1025, 1026-27

২। *Ibid*. Vol IX, pp 993-94

৩। *Ibid*. Vol X, pp 392, 533

স্বাধীনতার প্রস্তুতি এবং দাঙ্গা

কলকাতা : ১৯৪৭

২০ জুন ১৯৪৭ প্রাদেশিক বিধান পরিষদে বাঙলা-ভাগের প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। হিন্দু সদস্যরা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন; মুসলমানেরা বিরোধিতা করেন। ভোটদানের পদ্ধতিটি ছিল এরকম :

প্রথমে সদস্যরা এক সঙ্গে বসেন। কংগ্রেস চলতি সংবিধান সভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়; স্বতন্ত্র প্রতিনিধিরা সমর্থন করেন। মুসলিম লীগ বিরুদ্ধে ভোট দেয়; কমিউনিস্টরা নিরপেক্ষ থাকেন। তফশিলভুক্ত প্রতিনিধি লীগকে সমর্থন করেন। কংগ্রেসের পক্ষে ভোট ৯০; লীগের পক্ষে ১২৬।

এরপর মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের প্রতিনিধিরা আলাদাভাবে বসেন। কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ভোট দেয়। লীগ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে, কিন্তু পাকিস্তান সংবিধান-সভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট ৩৫; বিপক্ষে ১০৬।

এরপর হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের সদস্যরা আলাদাভাবে বসেন। কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট এবং হিন্দু মহাসভা প্রতিনিধিরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট দেয়; পক্ষে ভোট পড়ে ৫৮টি। মুসলিম লীগ দলবদ্ধভাবে বিরুদ্ধে ভোট দেয়; তাদের ভোট ছিল ২১টি। ৫৮-২১ ভোটে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব গৃহীত হয়; কারণ মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদে বলা ছিল, কোন একটি বিভাগে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা বাঙলা-ভাগ চাইলেই, তা গৃহীত হবে। হিন্দু বিভাগে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্তই নেয়; অতএব প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়।[১]

এটা ঘটনা যে, বাঙলার মুসলিম লীগ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঙলা-ভাগের বিরোধিতা করেছিল। লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে প্রাদেশিক নেতৃত্বের একটা দ্বন্দ্ব ছিল এই নিয়ে। ১০ জুন সারা ভারত মুসলিম লীগ বাঙলা-ভাগ মেনে নিলে বাঙলার লীগ নেতাদের মনে হয়েছিল, তাদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি : the game has not been fairly played। ৩ জুন বড়লাট দেশভাগ ঘোষণা করার পর লীগ নেতাদের নৈরাশ্য ব্যক্ত হয়েছিল এই ভাষায় : 'আমরা চেয়েছিলাম মাংস, আমাদের দেওয়া হলো পাথর।'[২]

হিন্দু মহাসভা আর কংগ্রেস অন্যদিকে উল্লসিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিনটিকে শ্যামাপ্রসাদ বর্ণনা করেছিলেন হিন্দুদের 'মুক্তির দিবস' বলে; হিন্দুদের পক্ষে উল্লাসের কারণ : পশ্চিম বাঙলাকে পাকিস্তান থেকে আলাদা রাখা সম্ভব হয়েছে। মুসলমানদের হতাশার কারণ : পুরো বাঙলা, বিশেষত কলকাতাকে, পাকিস্তান পেল না।

সাধারণ মানুষ যাঁরা বাঙলা-ভাগে সায় দিয়েছেন, তাঁদের মনের মধ্যে কাজ করেছে একটা মিশ্র অনুভূতি। বঙ্গভঙ্গকে ভাবা হচ্ছিল একটা অপরিহার্য ট্র্যাজেডি। চার দশক আগে যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক উত্তাল জন-আলোড়ন দেখেছিল বাঙলা, সেই

১। *Amrita Bazar Patrika*, June 21, 1947

২। *Ibid*, June 11, 5, 1947

বাঙলাকেই যে মেনে নিতে হয় অঙ্গচ্ছেদ—এ বেদনা ভুলে যাওয়া সহজ ছিল না; তবু একটা স্বস্তির বোধ মানুষের মনে এসেছিল যে, দাঙ্গা-খুনোখুনি অন্তত বন্ধ হবে এরপর। কিন্তু সেই স্বস্তিবোধের লেশমাত্রও আর থাকে না, যখন ২০ জুনের কয়েকদিন পরেই আবার দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় কলকাতায় এবং বিচ্ছিন্নভাবে দাঙ্গা চলতেই থাকে।

২২ জুন কলকাতায় ১৩টি হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে; মৃত্যু হয় চার জনের। ২৪ জুন কয়েকটি অঞ্চলে বোমাবাজি এবং আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে। ২৬ জুন বেলেঘাটায় লরির ওপর বোমা ফেলা হয়। চারজনের মৃত্যু হয় ওই দিন; আহত ৩৫। ২৭ তারিখে হাওড়ায় হাঙ্গামা হয়; ঢাকায় ট্রেন থেকে একটি মেয়েকে ছিনতাই করা হয়। ২৮ জুন কলকাতার শ্যামপুকুরে পুলিস গুলি চালায়; ৬ জন মারা যান। পরের দিন চিৎপুরে হাঙ্গামা; মৃত ৪।[১]

দাঙ্গা প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে ওঠে আবার; এ অবস্থা চলে পুরো জুলাই মাস। স্বাধীনতার দিন যত এগিয়ে আসে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা তত বেড়ে যায়। অগাস্টের ১২-১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনই কিছু না কিছু দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে কলকাতায়। ৪ জুলাই মানিকতলায় চলন্ত জিপ থেকে স্টেনগান চালিয়ে দুজনকে হত্যা করে গুণ্ডারা। ট্রাম-বাসের চালকদের ওপর আক্রমণ নিয়মিত ঘটনা হয়ে ওঠে এই সময়। নিরাপত্তার অভাবে কর্মীরা কাজ করতে পারছিলেন না। ৭ জুলাই থেকে পরপর ৪ দিন ট্রাম বাস বন্ধ ছিল কলকাতায়। অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে। ৩০ জুলাই ১৪ জনের মৃত্যু হয়; আহত ৭০। জোড়াসাঁকোয় একটি বাস লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছোঁড়া হয়। বালিগঞ্জে বিশেষ ধরনের পোশাক পরা যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে মারধর করা হয়। বেলেঘাটা-মুচিপাড়া-বড়বাজার-তালতলা-এন্টালি এলাকায় দাঙ্গা মারাত্মক চেহারা নেয়। বোমাবাজি আর অ্যাসিড ছোঁড়ার সঙ্গে চলে খুনজখম, লুঠপাট; যথেচ্ছ ব্যবহার হয় বোমা, অ্যাসিড, স্টেনগান। ৪-৩১ জুলাই এই তিন সপ্তাহে ছুরি আর বোমার ঘায়ে আহত হন ১৬৩ জন; গুলিবিদ্ধ ১১৩; অ্যাসিডে পুড়ে আহত-র সংখ্যা ৪৭; অন্যান্য কারণে আরও ১২৩।[২] বিচ্ছিন্ন আকারে হলেও দাঙ্গা যে এই সময় কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, অসম্পূর্ণ এই হিসেব থেকেও বোঝা যায়।

কলকাতার এই পর্বের দাঙ্গার একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ছিল। আক্রমণের লক্ষ্য প্রধানত মুসলমান বস্তি; দাঙ্গাটা করছে পেশাদার গুণ্ডা-দুষ্কৃতীর দল, তাদের অনেককেই ভাড়া করে আনা হয়েছে বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু গুণ্ডারাই হিন্দুর দোকান লুঠ করছে। মধ্যবিত্তদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা তো নয়ই, সমর্থনও তেমন নেই। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সঙ্গে এটা একটা বড় তফাত। 'প্রবাসী' (ভাদ্র ১৩৫৪), 'শনিবারের চিঠি' (আষাঢ় ১৩৫৪)-র মতো হিন্দু পত্রিকাতেও এই দাঙ্গার নিন্দা করা হচ্ছে; তবে সাধারণভাবে হিন্দু পত্র-পত্রিকাতে এই দাঙ্গাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

আক্রমণকারীরা, এই পর্বের দাঙ্গায়, প্রধানত হিন্দু; তবে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে মুসলমান গুণ্ডারাও সক্রিয়। ৬ জুলাই বউবাজারে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করা হয় মুচিপাড়া থানার ও. সি.-কে। অভিযোগ ছিল—ও. সি.-র নির্দেশে আমহার্স্ট স্ট্রীটের রথের মেলায় হিন্দু মহিলাদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে। পরের দিন তাঁর মৃতদেহ

১। *Ibid*, June 23-30, 1947

২। *Ibid*, July 5, 8-11, 27-31, August 2, 6, 8, 1947, *The Statesman*, August 4, 1947

নিয়ে শোকমিছিল বের হলে একদল মুসলমান হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ধর্মতলা-বউবাজার অঞ্চলে মারদাঙ্গা শুরু করে দেয়। দোকানপাট লুঠ হয়, ট্রামবাসের ওপর বোমা ছোঁড়া হয়; গুলিও চলে। আক্রান্ত হন অফিসফেরত যাত্রীরা। ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছিল ওই দিনের ঘটনায়। ৯ জুলাই নৃশংসভাবে খুন করা হয় বিখ্যাত শিল্প প্রযোজক (ইমপ্রেসারিও) হরেন ঘোষকে; তিনি নিহত হন ওয়াছেল মোল্লা ভবনে তাঁর নিজের অফিসে; তাঁর দেহটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে একটা স্যুটকেসে ভরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল পার্ক স্ট্রীটে রডন স্কোয়ারের সামনে। হরেন ঘোষ বাঙলার শিল্পসংস্কৃতির জগতে একটি বিশিষ্ট নাম; উদয়শঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠানের প্রযোজনা করতেন তিনি। সর্বজনপ্রিয় এই মানুষটিকে হত্যা করার জন্যে বোম্বাই থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল 'বোম্বাইয়া' নামে এক কুখ্যাত গুণ্ডাকে।[১]

দেখা যাচ্ছে, হাঙ্গামা চালিয়ে যাবার চক্রান্ত দু-তরফেই রয়েছে। ১৮ জুলাই গোপন নোটে গভর্নর লিখছেন, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গে থাকবে—এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়ে গেলেই মুসলমান গুণ্ডারা হাঙ্গামা করবে, এমন আশঙ্কা আছে।[২] তবে বাস্তব ক্ষেত্রে দাঙ্গাটা করছে প্রধানত ভাড়াটে গুণ্ডারা আর তাদের ব্যবহার করছে একটা কায়েমী স্বার্থ। সাম্প্রতিক একটি রচনায় ('চতুরঙ্গ', মার্চ ১৯৮৯) সুনীল সেন নাম করেই বলেছেন, এই পর্বের দাঙ্গায় 'বড়বাজারের মাড়োয়ারি'দের মদত ছিল। মুসলমানদের কলকাতা থেকে তাড়ানোর জন্যেই যে দাঙ্গাগুলো ঘটানো হচ্ছিল, অন্যান্য সূত্র থেকেও তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের তাতিয়ে এক ধরনের লিফলেট ছড়ানো হয়; তাতে বলা ছিল, মুসলমান শ্রমিকরা কলকাতার নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত করে দেবার চক্রান্ত করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মহম্মদ ইসমাইল ও মৃণালকান্তি বসু এক বিবৃতি দিয়ে এই অপপ্রচারের নিন্দা করেন।[৩] দাঙ্গাটা এই পর্বে ঘটছিল প্রধানত বড়বাজার-চিৎপুরের মতো ব্যবসাপ্রধান অঞ্চলে; অথবা বেলেঘাটা-তালতলা-এন্টালির মতো এলাকায়, যেখানে মুসলমানদের বড় বস্তি আছে। মুসলমানদের কলকাতা থেকে মেরে তাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়েই ঘটানো হচ্ছিল এইসব দাঙ্গা। প্রক্রিয়াটার শুরু ১৯৪৬-এর পর থেকেই। মুসলমানরা যেমন সেই সময় হিন্দুদের পাড়াছাড়া করে দিয়েছিল কোন কোন অঞ্চল থেকে, হিন্দুরাও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল কোন কোন মুসলমান বস্তি।[৪] মাড়োয়ারি ব্যবসাদারদের মদত এই দাঙ্গায় ছিল; কলকাতায় তাদের প্রতিপত্তিও তখন বাড়ছিল। কলকাতার সব ব্যবসাবাণিজ্য মাড়োয়ারিরাই দখল করে নেবে, এই আশঙ্কা বাঙালি হিন্দুর মনে তখনই দেখা দিয়েছিল।[৫]

১। *Amrita Bazar Patrika*, 7-8, 15 July, 1947 ; মৌখিক সূত্র : অলোক ঘোষ

২। *The Transfer of Power*, ed by N Mansergh, Vol. XII, pp 92, 224-25

৩। *Morning News*, August 2, 1947

৪। মৌখিক সূত্র : এস. চন্দ, শ্যামবাজার; বিরাজমোহন ঘোষ, এন্টালি

৫। ভবতোষ রায় সম্পাদিত 'হিন্দু' পত্রিকা গোঁড়া হিন্দুদের কাগজ হলেও বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিল। ওই পত্রিকার ১৩ আষাঢ় সংখ্যায় এবং 'পরিচয়'-এ (আষাঢ় ১৩৫৪) 'বঙ্গভঙ্গ ও বাংলার ঐক্য' নামের একটি রচনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এই বলে যে, বাঙলা ভাগ হলে পশ্চিম বাঙলা মাড়োয়ারি পুঁজির অধীন হয়ে পড়বে।

অগাস্টের শুরু থেকে অবস্থা আরও খারাপ হয়। ১ অগাস্ট শ্যামপুকুর অঞ্চলে গুণ্ডারা গুলি করে মারে দুই মহিলাকে। গুণ্ডারা এই সময় অটোমেটিক রাইফেলও ব্যবহার করতে শুরু করে। ৫-৬ অগাস্ট ব্যাপক হাঙ্গামা হয় বেলেঘাটা অঞ্চলে; আক্রান্ত হয় কুখ্যাত মিয়াবাগান বস্তি।[১] পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেসের 'শ্যাডো' মন্ত্রিসভা তৈরি হয়ে গেছে; ফলে এরকম ধারণা চালু হয়ে যায় যে, এখন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালালে আর কোন বাধা আসবে না। এই ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না; ঘোষ মন্ত্রিসভা এই সময় পুলিসে বড় রকম রদবদল করেছিল এবং ১৫ অগাস্ট দিনটি শান্তিপূর্ণ রাখার অছিলায় পুলিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল মুসলমান বস্তিগুলি; অপসারিত হয়েছিল কুখ্যাত পাঞ্জাবী মুসলিম বাহিনীও।[২] এইসব ব্যবস্থা দেখে কলকাতার মুসলমানদের মধ্যে একটা ত্রাসের মনোভাব ছড়িয়ে যায়।

৯ অগাস্ট গান্ধী কলকাতায় পৌঁছলে মুসলমান নেতারা তাঁকে জানান, হিন্দুরা মুসলমান-বিদ্বেষে উন্মত্ত হয়ে গেছে; বেছে বেছে মুসলমান বস্তির ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে; আরও বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা আছে। ভীতসন্ত্রস্ত নেতারা গান্ধীকে অনুরোধ করেন, ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত কলকাতায় থেকে যেতে। হিন্দুরাও কেউ কেউ স্বীকার করেন, কলকাতার অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক; গান্ধীজীর উপস্থিতিই কেবল পারে সেই আগুন নেভাতে : pour water on the raging fire that was burning।[৩]

এটা ঘটনা যে, মুসলিম পুলিসবাহিনীর আচরণে ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় থেকেই উগ্র সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে-রকম নির্বিচারে তা করা হয় এবং হিন্দু গুণ্ডা-দুর্বৃত্তদের যেভাবে ছাড় দেওয়া হয়, তাতে কলকাতার মুসলমানদের সন্ত্রস্ত বোধ করার কারণ ছিল। ঘোষ মন্ত্রিসভা এ ব্যাপারে পূর্বতন সোহরাবর্দি মন্ত্রিসভার পথই অনুসরণ করেছিল এবং হিন্দু পুলিসের আচরণেও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব এসে যাচ্ছিল। কলকাতায় প্রতিদিনই গুলি চলছিল; নিরপরাধ মানুষও মারা যাচ্ছিলেন গুলিতে। ১১ অগাস্ট পুলিস ৩২ রাউন্ড গুলি চালায় এন্টালিতে।[৪]

গুণ্ডামি-খুনোখুনি এই সময় একটা বিশেষ চেহারা নেয়। পেশাদার গুণ্ডা-দুষ্কৃতীরা এবং তাদের সঙ্গে সাধারণ একদল যুবকও মারাত্মক সব অস্ত্র নিয়ে দাঙ্গায় নামে। ছেচল্লিশের দাঙ্গাতে অস্ত্র বলতে ছিল প্রধানত লাঠি, মুগুর, গুলতি, ছোরা, মাংস কাটার ছুরি। কিন্তু এই পর্বের দাঙ্গায় দেখা যাবে, স্টেনগান, অ্যাসিড, পেট্রল বোমা, গ্রেনেড আর মারাত্মক ধরনের ছোরার যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। ১৯৪৬-এর পরই হিন্দুরা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের পর সৈন্যরা স্টেনগান বেচে দিচ্ছিল—সস্তায় পাওয়া

১। *Morning News*, August 2, *Amrita Bazar Patrika*, August 6; *The Statesman*, August 6, 1947; N K. Bose, *My Days with Gandhi*, p 225

২। *Amrita Bazar Patrika*, August 7; *Modern Review*, August 1947, N. K. Bose, *op cit*, pp 255, 260

৩। N. K. Bose, *op cit*, pp 255-57, *Amrita Bazar Patrika*, August 10-11, 13, 1947

৪। *Morning News*, August 12, 1947

সেই অস্ত্র প্রতিরোধ-বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং তাদের একাংশ প্রতিরক্ষার নামে খুনোখুনি শুরু করে দেয়। মধ্য কলকাতায় বিজয় সিং নাহারের বাড়ির সংলগ্ন কুমার সিং হল্‌-এ যুবকদের নিয়ে অস্ত্রশিক্ষার মহড়া চলে। খিদিরপুর অঞ্চলে ডকের চোরাপথে প্রচুর অস্ত্র যোগাড় হয়। পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়াম সমিতিগুলি অস্ত্রশিক্ষার আখড়া হয়ে ওঠে।[১]

ছেচল্লিশের অক্টোবরেই কলকাতার একটি মুসলিম পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়েছিল, বাগমারি অঞ্চলের দু-একটি কারখানা থেকে অ্যাসিড জোগান দেওয়া হচ্ছে। 'স্টেট্‌সম্যান' লিখেছিল, কলকাতায় এখন এমন কিছু লোক পাওয়া যাচ্ছে, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় একবার রক্তের স্বাদ পাওয়ার পর যারা এখন খুনোখুনিটাকে একটা খেলা হিসাবে নিয়েছে।[২] পেশাদার গুণ্ডা-দুষ্কৃতীদের রাজনীতিতে ব্যবহারের এই নির্বিবেক প্রক্রিয়া মুসলিম লীগই প্রথমে শুরু করেছিল ১৯৪৬-এর দাঙ্গায়; পরে হিন্দুরাও তা নকল করতে শুরু করে এবং বাঙলা-ভাগের পক্ষে-বিপক্ষের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় খুনোখুনি-মারদাঙ্গার এই প্রাণঘাতী রাজনীতি।

অবস্থাটা যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, এটা সম্ভবত গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন। তাই লীগ নেতাদের অনুরোধে তিনি ১৫ অগাস্ট কলকাতায় থেকে যেতে রাজি হন। ১০ অগাস্ট সোদপুরে এক বিশাল জনতার সামনে তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে বর্বরতার এই প্রকাশ দেখে লজ্জায় তাঁর মাথা নত হয়ে গেছে। তিনি শুনেছেন, কলকাতায় এখন এক সম্প্রদায়ের লোক আর এক সম্প্রদায়ের এলাকায় যায় না, তিনি উপদ্রুত অঞ্চলগুলি ঘুরে অবস্থাটা দেখতে চান। তিনি শুনেছেন, মুসলমান পুলিস আগে যা করেছে, হিন্দু পুলিস এখন ঠিক তা-ই করছে। তিনি দেখতে চান, এই অভিযোগ কতদূর সত্যি। কলকাতার জনজীবনে যতদিন না সুস্থতা ফিরে আসে ততদিন পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে : We shall have to work as long as every Hindu and Mussulman in Calcutta does not safely return to the place where he was before।[৩]

বেলেঘাটায় গান্ধীজী

দাঙ্গা-পীড়িত বেলেঘাটা অঞ্চলে ১৫০ বেলেঘাটা মেন রোডের একটি বাড়িতে গান্ধী থাকবেন ঠিক হয়। তিনি মুসলমান বস্তির মধ্যে ছিলেন, এই প্রচলিত ধারণাটি সত্য নয়। হায়দারি ম্যানসন বাড়িটি আসলে ছিল নবাব আবদুল গনির পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি; সেখানে থাকতেন এক মুসলমান রমণী, সাধারণের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'বাঈ আম্মা' নামে। গান্ধীর অনুরোধে সোহরাবর্দিও তাঁর সঙ্গে থাকবেন ঠিক হয়; এটা গান্ধী শর্ত করে নিয়েছিলেন; সোহরাবর্দির জীবন বিপন্ন হতে পারে, এটাও তিনি জানিয়ে রেখেছিলেন। ১১ অগাস্ট সোদপুর থেকে গান্ধী কলকাতায় পৌঁছলে এক বিশাল জনতা তাঁকে স্বাগত জানায়। সংবাদপত্রের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গান্ধীর গাড়ির চারপাশে শুধু মানুষের মাথা রীতিমতো ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে মহাত্মাকে দেখার জন্যে।[৪]

কিন্তু বিরোধী একটা শক্তি তলায় তলায় কাজ করে যাচ্ছিল। দু দিন পরেই এক বিক্ষুব্ধ জনতা কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে দাবি করে, গান্ধীকে কলকাতা

১। সাক্ষাৎকার : বিজয় সিং নাহার; ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়; গোপাল মুখোপাধ্যায়

২। *Morning News*, Oct 30, 1946, *The Statesman*, Oct 30, 1946

৩। N K. Bose, *op cit*, pp 257, 259

৪। *Amrita Bazar Patrika*, Aug. 12, 1947

ছেড়ে চলে যেতে হবে; অথবা কাঁকুড়গাছি-উল্টোডাঙা অঞ্চলে থাকতে হবে; কারণ ওই সব অঞ্চল থেকে বহু হিন্দু পরিবার উৎখাত হয়েছে। আরও অভিযোগ করা হয়, এক বছর আগে কলকাতার হিন্দুরা যখন মার খাচ্ছিল কোথায় ছিলেন গান্ধী, কোথায় ছিল তাঁর দায়িত্ববোধ?[১]

অবস্থা কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে এসে গেলেও অশুভ একটা ইঙ্গিত রয়েই যায়। কলকাতার অবস্থার অবশ্য উন্নতি হতে শুরু করে। ১২ অগাস্ট মাত্র দু জায়গায় হাঙ্গামা হয়েছিল; ১৩-১৪ তারিখে মোটামুটি শান্ত ছিল শহর, আর ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর, ভ্রাতৃত্ববোধ আর মিলনের এক উষ্ণ আবেগময় প্রকাশ দেখা গেল কলকাতায়; 'বন্দে মাতরম' আর 'জয়হিন্দ'-এর সঙ্গে ধ্বনি উঠল : 'হিন্দু-মুসলিম এক হো'; 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় সেদিন লেখা হয়েছিল : Fratricidal Bloodbath Suddenly Ends।

প্রবীণজনের মনে আজও গাঁথা হয়ে আছে সেই স্মৃতি : ১৪ অগাস্ট রাত বারোটায় শঙ্খধ্বনি; অঞ্চলে অঞ্চলে তোরণ নির্মাণ চলেছে সারারাত ধরে। পরের দিন হিন্দু-মুসলমান প্রকাশ্যে আলিঙ্গন করেছে পরস্পরকে। মুসলমানেরা হিন্দুদের মসজিদে আমন্ত্রণ জানিয়েছে; হিন্দুরা মুসলমানদের বুকে জড়িয়ে ধরেছে; শিখ ড্রাইভার জানিয়ে দিয়েছে, আজ ট্যাক্সিতে উঠলে পয়সা লাগবে না। চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ সবার জন্য উন্মুক্ত। গোলাপজল ছিটানো হচ্ছে পথচারীদের গায়ে; স্বাধীনতার আনন্দে উচ্ছ্বসিত জনতা ভেঙে ফেলেছে রাজভবনের গেট।

কলকাতার সর্বত্র তখন 'মহাত্মাজী'-র জয়ধ্বনি। ১৭ অগাস্ট 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখে, কলকাতা পাগল হয়ে গেছে গান্ধীর নামে : City Goes Gandhi Mad। হাজার হাজার মানুষ দেখতে আসে বেলেঘাটার গান্ধী শিবির। শুধু ১৫ তারিখেই দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল ১০,০০০। জনতার অনুরোধে গান্ধীজীকে বারবার এসে দাঁড়াতে হয় জানলায়। আনন্দোৎসবে যোগ না দিয়ে গান্ধীজী দিনটি কাটান অনশন পালন করে। কংগ্রেস নেতাদের তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা উৎসবে তাঁর সায় নেই; কারণ : 'সব দিক জ্বল রহে হ্যঁায়, ভুখা মর রহে হ্যঁায়, নাঙ্গে মর রহে হ্যঁায়।'[২]

অবস্থা যে এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তা ঠেকানোর জন্যে গান্ধী কি করেছিলেন, সে প্রশ্ন অবশ্যই তোলা যায়। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস-লীগের বিরোধের সময় তাঁর ভূমিকা কংগ্রেসের অন্য নেতাদের থেকে খুব আলাদা ছিল না।[৩] ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যেই কংগ্রেস মোটামুটি দেশভাগের পক্ষে রাজি হয়ে গিয়েছিল গান্ধী সে-সময় কংগ্রেসের মত পাল্টানোর জন্যে খুব চেষ্টা করেননি; তবে মুখে তিনি বারবারই দেশভাগের বিরোধিতা করেছেন। ১ জুন 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি লেখেন, 'পাকিস্তান দাবি অন্যায়; বাঙলা আর পাঞ্জাব ভাগও অন্যায়।' অথচ এর দু সপ্তাহ পরে কংগ্রেস যখন বাঙলাভাগের সমর্থনে প্রস্তাব নিল, গান্ধী বাধা দিলেন না। ১৩ জুন

১। *Ibid*, Aug. 14, 1947; N. K Bose, *op cit*, p 262

২। N K Bose, *op cit*, pp 256, 266

৩। ওয়াভেল লিখেছেন, ১৯ অগাস্ট ১৯৪৬ মুসলিম লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে এরকম একটি খসড়া প্রস্তাব গান্ধী এবং রাজাগোপালাচারী প্রস্তুত করেছিলেন; কিন্তু নেহরু এবং প্যাটেল তা নাকচ করে দিলে গান্ধী আপত্তি করেননি। ওয়াভেলের ভাষায়, এটা ছিল a typical piece of Gandhian hypocrisy. (Penderal Moon, *Wavell, The Viceroy's Journal*, p 336)

কংগ্রেস কার্য নির্বাহক সমিতি বাঙলাভাগ সমর্থন করেছিল। পরের দিন কংগ্রেসের সভায় গান্ধী কংগ্রেস সদস্যদের সেই প্রস্তাব মেনে নেবার জন্যে অনুরোধ করেন এই ভাষায় যে, কার্য নির্বাহক সমিতি যেহেতু কংগ্রেসেরই প্রতিনিধি, তার সিদ্ধান্ত নাকচ করা অনুচিত : they must remember that the Working Committee as their representative had accepted the plan and it was the duty of the AICC to stand by them। গান্ধী স্বীকার করেন, দেশভাগ কংগ্রেসের 'নৈতিক ব্যর্থতা' (moral failure); কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তিনি জানিয়ে দেন যে, কংগ্রেসের পথে তিনি বাধা হবেন না।[১] ১৪ জুন কংগ্রেসের সভায় বাঙলাভাগের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবার পর গান্ধী দিনটি কাটান মৌনব্রত পালন করে।[২]

গান্ধীর এই ভূমিকা খুব শ্রদ্ধেয় বলা যায় না। কিন্তু দাঙ্গা-খুনোখুনি ঠেকানোর জন্যে এরপর তাঁর যা ভূমিকা, প্রথমে কলকাতা এবং পরে দিল্লিতে তিনি যেভাবে জীবনপণ করেন, তার আন্তরিকতা এক বরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কলকাতায় স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসের আড়ালে বিভেদের গূঢ় অশনি-সংকেত গান্ধীর নজর এড়াতে পারেনি; কিছু আভাস ১৪ তারিখেই পাওয়া গিয়েছিল। বেলেঘাটায় গান্ধী শিবিরে সোহরাবর্দি ভাষণ দিতে উঠলে জনতা চিৎকার করে থামতে বলে, অশোভন ভাষায় বিদ্রূপ করে; সোহরাবর্দিকে বারবার বাধা পেতে হয়। সোহরাবর্দি যখন বলেন, হিন্দুদের কাছে তিনি অঙ্গীকার করছেন, হিন্দু-মুসলমান মিলনস্থাপনই হবে তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য, জনতা চিৎকার করে জানিয়ে দেয়, কলকাতা দাঙ্গার হোতা সোহরাবর্দির মুখে এ কথা মানায় না। সম্ভবত সেই প্রথম প্রকাশ্যে সোহরাবর্দিকে স্বীকার করতে হয়, তিনি অনুতপ্ত।[৩]

বোঝা যায়, সাধারণ হিন্দু বিভেদ ভুলে মুসলমানকে কাছে টেনে নিলেও বিদ্বেষের মনোভাব তলায় তলায় রয়েই গেছে। অন্যদিকে মুসলমানরা স্বাধীনতার আনন্দোৎসবে যোগ দিলেও, মুসলিম লীগ দিনটিকে পালন করেছে শোক দিবস হিসাবে। লীগপন্থী দৈনিক 'মর্নিং নিউজে' ১৫ অগাস্টের শিরোনামে ভারতের নামের আগে জায়গা পেয়েছে পাকিস্তান : Sovereign Pakistan and India Born. ১৫ অগাস্ট কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে ওই পত্রিকা।

গান্ধীর আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হতে বেশিদিন লাগল না; স্বাধীনতার পর দু সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই আবার দাঙ্গা শুরু হল কলকাতায়। ৩ সেপ্টেম্বর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সংবাদ শিরোনাম—কলকাতায় বর্বরতা আবার ফিরে এসেছে : Calcutta Back to Savagery Again.

আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, ১৫ অগাস্ট এক শিখ ড্রাইভারের আহ্বানে তার ট্যাক্সিতে চড়ে ঘুরতে ঘুরতে শ্যামবাজারে এসে তিনি দেখতে পান, বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা 'কুখ্যাত পশ্চিমা গুণ্ডাগুলি' একটা বস্তির সামনে 'লম্বা হয়ে শুয়ে আছে'। এদের তখনও ফেরত পাঠানো হয়নি, কারণ প্রয়োজন তখনও ফুরোয়নি। পনের দিন পরে এই পশ্চিমা গুণ্ডাদেরই আবার কাজে লাগানো হবে মারকাট-খুনোখুনিতে।[৪]

১। কংগ্রেস নেতা পি. ডি. ট্যাণ্ডন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ট্যান্ডন বলেন, তিনি বরং ব্রিটিশরাজ মেনে নেবেন, কিন্তু দেশভাগ নয়। [*Searchlight*, June 16, 1947]

২। *N K Bose*, pp 245-46, *Amrita Bazar Patrika*, June 16, 1947

৩। *Amrita Bazar Patrika*, Aug. 15, 1947

৪। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 'অতীত দিনের স্মৃতি', পৃ. ৩০১-২

কলকাতা দাঙ্গার শেষ অধ্যায়

সেপ্টেম্বর : ১৯৪৭

'... এরপর এল স্বাধীনতার রাত্রি। দীপাবলীও এত রোশনাইতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। কারণ দীপাবলীতে শুধু প্রদীপের আলো জ্বলে। কিন্তু আজকে বোমা ফাটছে—মেশিনগান চলছে। ব্রিটিশ রাজত্বে ভুলেও কোথাও একটা রিভলবার পাওয়া যেত না। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম রাত্রেই না জানি কোথা থেকে এত বোমা হ্যান্ড-গ্রেনেড মেশিনগান ব্রেনগান স্টেনগানের গুলি ফুলঝুরির মতো ঝরতে লাগল। ...

সশস্ত্র হিন্দু আর শিখদের যৌথবাহিনী মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগাচ্ছিল আর উল্লাসে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। আর মুসলমানরা ঘরে লুকিয়ে আক্রমণকারীদের ওপর মেশিনগান চালাচ্ছিল আর হ্যান্ড-গ্রেনেড ছুঁড়ছিল। ...'

* * *

কৃষণ চন্দরের 'অমৃতসর' গল্প থেকে নেওয়া এই অংশটি। একদিকে যখন স্বাধীনতার শঙ্খনাদ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সুচেতা কৃপালনীর গলায় 'বন্দে মাতরম', বেতারে মধ্যরাত্রে জওহরলাল নেহরুর ভাবগম্ভীর ভাষণ, অন্যদিকে পাঞ্জাবে—অমৃতসর আর লাহোরে—তখন কী ঘটছিল তার একটা অংশমাত্র ধরা আছে এই উদ্ধৃতিতে। এ অবস্থা চলে পাঁচ-সাতদিন ধরে; উদ্বাস্তু হয়ে যায় লক্ষেরও বেশি হিন্দু-মুসলমান-শিখ পরিবার ইতিহাসে সে ঘটনা লেখা আছে পাঞ্জাব ট্র্যাজেডি বলে।[১]

কলকাতার অবস্থা তখন তুলনায় শান্ত। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর এক সুন্দর কবিতার মতো হয়ে আছে পনেরই অগাস্টের স্মৃতি। স্বাধীনতার আনন্দের চেয়ে দাঙ্গা থেমে যাওয়ার স্বস্তিই যেন তখন বড় হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের কাছে। অঞ্চলে অঞ্চলে শান্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে। কমিউনিস্টদের উদ্যোগে গঠিত শান্তিবাহিনীর কমান্ডার প্রখ্যাত বিপ্লবী অনন্ত সিংহ;নারীবাহিনীর বিশাল শান্তি মিছিল বেরিয়েছে শহরে। ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-র পক্ষ থেকেও শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৬ অগাস্ট শান্তি কমিটির এক বিশাল মিছিল উত্তর কলকাতায় পথ পরিক্রমা করে। দেশবন্ধু পার্কে মিছিল শেষ হওয়ার পর ভাষণ দেন আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক শাহনাহাজ খান। ৩০ অগাস্ট বিভিন্ন শান্তি কমিটির উদ্যোক্তারা বেলেঘাটায় গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর অনুরোধে সব দল এবং সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি হয় 'কেন্দ্রীয় শান্তিসেনা'; সম্পাদক : দেবতোষ দাশগুপ্ত।[২]

১। লিওনার্ড মোশলে এই দাঙ্গার যে বিবরণ দিয়েছেন তা পড়তে কষ্ট হয় : শিশুদের পা ধরে তুলে আছাড় মারা হল; মেয়েদের ধর্ষণ করা হল আর তাদের স্তন কেটে নেওয়া হল; অন্তঃসত্তা নারীদের পেট চিরে বাচ্চা নষ্ট করে দেওয়া হল। (*The Last Days of the British Raj*, p 279)

২। *Calcutta Municipal Gazette*, 2-30 August, 1947, pp 89-90;
সরোজ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা' (২য় খণ্ড), পৃ. ৪০৭-১০

৩১ অগাস্ট মুসলমান ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে গ্র্যান্ড হোটেলের এক সমাবেশে সংবর্ধনা জানানো হয় গান্ধীকে। বিগত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরগুলির সংস্কারের জন্যে ১০০১ টাকা গান্ধীর হাতে তুলে দেন ব্যবসায়ীরা; গান্ধীজীকে তাঁরা শ্রদ্ধা জানান 'ভারতের স্বাধীনতার মহান স্থপতি' বলে।[১] ২ সেপ্টেম্বর গান্ধীর নোয়াখালি চলে যাবার কথা; কিন্তু এবারও তাঁকে সে পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হয়। কারণ ৩১ অগাস্ট রাত থেকেই হঠাৎ আবার দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় কলকাতায়।

কলকাতায় আবার দাঙ্গা

৩১ অগাস্ট রাত দশটা নাগাদ একদল হিন্দু গুণ্ডা বেলেঘাটায় গান্ধী শিবিরে ঢুকে জানলার কাচ, আসবাবপত্র ভাঙতে শুরু করে এবং চিৎকার করে বলে, সোহরাবর্দিকে তাদের সামনে হাজির করা হোক—তার সঙ্গে মোকাবিলা বাকি আছে। তাদের নিরস্ত করার চেষ্টা বিফল হচ্ছে দেখে গান্ধীজী নিজে উঠে এসে জানলায় হাতজোড় করে দাঁড়ান। তিনি জনতাকে শান্ত হতে বলেন; তাঁর কথা বাঙলায় তর্জমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কাজ হয় না। এই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে প্রথমে একটা লাঠি, পরে একটা ইঁট ছোঁড়া হয়। দুটোর কোনটাই তাঁর গায়ে লাগেনি; তবে পাশে দাঁড়ানো এক মুসলমান ভদ্রলোক সামান্য আহত হয়েছিলেন। জনতা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো একটি আহত লোককে সঙ্গে করে এনেছিল। বলা হয়, লোকটি মুসলমান গুণ্ডাদের আক্রমণে আহত হয়েছে। কেন এটা হল গান্ধীকে তার জবাব দিতে হবে। জনতার খুবই উগ্র মেজাজ ছিল। গোটা ঘটনাটার মধ্যে একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্তও ছিল; কারণ পরে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল, লোকটির আঘাত মোটেই গুরুতর নয়।[২] হাঙ্গামা বাঁধানোর উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তাকে কাজে লাগানো হয়েছিল।

পরিস্থিতি এরপর আরও খারাপের দিকে যেতে পারত। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ এবং পুলিস কমিশনার নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। কিন্তু এটা যে কোন বিচ্ছিন্ন হাঙ্গামার ঘটনা ছিল না, পরের দিন থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ১ সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে বড় রকমের দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় মধ্য কলকাতায়। অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছিল সেদিনের ঘটনায়; আহত ৩৭১।[৩]

অগাস্টের প্রথমদিকের দাঙ্গার মতো এবারের দাঙ্গাতেও আক্রমণকারীরা ছিল প্রধানত পেশাদার হিন্দু গুণ্ডা, বেশির ভাগই বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা। দাঙ্গাটা ঘটছিল প্রধানত পূর্ব এবং মধ্য কলকাতায়, যেসব অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বসতি আছে। আক্রমণের লক্ষ্য ছিল প্রধানত মুসলমানদের ঘর-বাড়ি। বেলেঘাটা-তালতলা-এন্টালি এলাকায় একের পর এক বস্তি আক্রান্ত হয়; হাতিবাগানের কাছে নলিন সরকার স্ট্রীটে পুরো একটা মুসলমান বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয় ২ সেপ্টেম্বর; আহত ৭৫। এ ছাড়া পুলিসের গুলিতেও কয়েকজন মারা যান। সেনাবাহিনী

১। *Amrita Bazar Patrika*, Sept. 1, 1947

২। N. K Bose, *My Days with Gandhi*, pp 272, 275-76

৩। *The Statesman*, Sept 2, 1947

নামানো হয়েছিল পয়লা সেপ্টেম্বর থেকেই। খুনজখমের সঙ্গে দোকান লুঠপাট, আগুন লাগানোর ঘটনাও চলতে থাকে। ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রবল বর্ষণ এবং রাস্তায় জল জমে যাওয়া সত্ত্বেও অব্যাহত ছিল দাঙ্গা।[১]

এবারের দাঙ্গার একটা উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত গান্ধীজীকে বে-ইজ্জত করা। বেলেঘাটায় একটা মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় তিনি শিবির স্থাপন করেছেন, মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে চলছেন, মুসলমানরা তাঁকে সংবর্ধনা দিচ্ছে—এইসব ঘটনা হিন্দুদের একাংশ ভালো চোখে দেখছিল না। গান্ধী বেলেঘাটায় আসার পরই কোন কোন পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়েছিল, তিনি মুসলমান দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর শান্তি প্রয়াসকে বানচাল করে দেবার একটা চক্রান্ত এইসব দাঙ্গার পিছনে ছিল, এমন মনে করার তাই কারণ আছে।

১ সেপ্টেম্বর বেলেঘাটার একটি শোচনীয় ঘটনা গান্ধীকে একেবারে বিমূঢ় করে দেয়। তাঁর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে কিছু মুসলমান পরিবার মিয়াবাগান বস্তিতে ফিরে এসেছিল ইতিমধ্যে। নতুন করে আবার দাঙ্গা শুরু হলে তারা ভয় পেয়ে রাজাবাজারে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় ৩০ জন মুসলমানকে নিয়ে একটি ট্রাক যখন রাজাবাজারের দিকে যাচ্ছে, সেই সময় গুণ্ডারা তার ওপর বোমা ফেলে এবং দু জন সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। নির্মলকুমার বসু লিখছেন, এই ঘটনার কথা শোনামাত্রই গান্ধীজীর মুখ 'কঠিন' হয়ে ওঠে এবং তিনি প্রেস বিবৃতি দিয়ে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। গান্ধীজী বলেন, ওই দিন সন্ধে থেকে তাঁর অনশন শুরু হবে এবং যতক্ষণ না মানুষ হিংস্রতা (lynch law) ত্যাগ করে এবং শহরের জীবনে সুস্থতা ফিরে আসে, তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন : I therefore begin fasting from 8-15 tonight to end only if and when sanity returns to Calcutta.[২]

সন্ধ্যায় তাঁর অনশন যখন শুরু হচ্ছে, ততক্ষণে ঘটে গেছে আর একটি মর্মান্তিক ঘটনা : ছুরিকাহত হয়েছেন গান্ধীবাদী সংগঠক শচীন্দ্র মিত্র। দুপুরবেলা বড়বাজারে দাঙ্গা শুরু হয়েছে খবর পেয়েই শচীন্দ্রবাবু স্ট্র্যান্ড রোডে তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্গে নিয়ে 'হিন্দু মুসলিম এক হো' ধ্বনি দিতে দিতে চিৎপুরের দিকে এগোতে থাকেন। তাঁকে ছুরি মারা হয় নাখোদা মসজিদের কাছে। 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'-র প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শচীন্দ্র মিত্র। 'সংগঠন' নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করতেন। ৩ সেপ্টেম্বর মেডিক্যাল কলেজে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শেষ কথা ছিল : 'আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।'[৩]

স্বাধিকারপ্রমত্ত হিংসা

৩১ অগাস্ট রাত থেকে কলকাতার এই যে দাঙ্গা, এর পিছনে অনেকগুলো কারণ মিলেমিশে ছিল মনে হয়। গান্ধীকে হেয় করার চেষ্টা ছিল, পাশাপাশি ছিল সোহরাবর্দিকে

১। *Amrita Bazar Patrika*, Sept. 3; *The Statesman*, Sept. 3, 1947

২। N. K Bose, *op cit*, pp 272-73; *The Statesman*, Sept 3, 1947

৩। শচীন্দ্র মিত্র-র স্ত্রী অংশুরানী মিত্র-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২২. ৮. ৯১; *Amrita Bazar Patrika*, Sept 4, 1947

হত্যার পরিকল্পনাও। সোহরাবর্দি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, তাঁকে হত্যা করার জন্যে অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং এর পিছনে হিন্দু মহাসভার মদত ছিল। গান্ধীর ওপর যে আক্রমণ হয়েছিল, তার জন্যেও সোহরাবর্দি দায়ী করেছেন হিন্দু মহাসভাকে।[১]

দলের মদত থাকলেও দাঙ্গাকারীরা আসলে কোনো দলের প্রতিনিধিত্ব করছিল না। লক্ষ্যটা ছিল: কলকাতা থেকে মুসলমানদের তাড়ানো। কংগ্রেস সম্ভবত দল হিসাবে এই দাঙ্গার পিছনে ছিল না। কিন্তু প্রতিরোধ বাহিনী গঠনের নামে, স্বাধীন-বঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতার নামে যে গুণ্ডাবাহিনীকে তারা বিগত কয়েক মাস ধরে কাজে লাগিয়েছিল, স্বাধিকারপ্রমত্ত সেই বাহিনী যখন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে নির্বিচার খুনোখুনি শুরু করে দেয়—তাদের ওপর কংগ্রেসের আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।[২] একই কথা বলে চলে হিন্দু মহাসভার অবস্থান সম্পর্কেও। পরিস্থিতিটা মহাসভার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং নেতারা এই সময় কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন মনে হয়। পত্রপত্রিকার রচনায় তাই বারবারই লেখা হয়, বাইরে থেকে আমদানি করা গুণ্ডা আর বাজে লোকেরাই হাঙ্গামা করে যাচ্ছে এবং এর পিছনে সাধারণ মানুষের কোন সমর্থন নেই : it is clear that only goonda elements of up country joined by local rifraffs are trying to bring Calcutta back to conditions of the jungle. বলা হয়, সাধারণ মানুষ এই দাঙ্গা মোটেই চায় না; তারা বরং নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছে।[৩] আর একটি পত্রিকায় গান্ধীর ওপর আক্রমণকারীদের বর্ণনা করা হয় 'নরপশু' বলে এবং মন্তব্য করা হয়, উত্তর-মধ্য এবং পূর্ব কলকাতায় তারা নৃশংসভাবে খুনোখুনি চালাচ্ছে।[৪] 'আজাদ' পত্রিকার ওপর হামলার নিন্দা করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা যে বিবৃতি দেন, তাতেও বলা হয়েছিল, কলকাতায় এখন যা ঘটছে তা নিছক গুণ্ডামি : What is happening in Calcutta is pure goondaism and ... it has nothing to do with any communal or political issue.[৫]

২ সেপ্টেম্বর হিন্দু মহাসভার দুই নেতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বেলেঘাটায় গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনশন প্রত্যাহার করে নেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানান। ইতিমধ্যে বেলেঘাটার স্থানীয় মানুষ, উত্তর কলকাতার নাগরিকদের একটি দল এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরাও গান্ধীর

১। *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, ed by H R Talukdar (Dhaka 1987), pp 34, 108

২। শ্রমিক নেতা কমলাপতি রায় এ প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কংগ্রেস নেতা আচার্য কৃপালনীর উদ্যোগে দাঙ্গা প্রতিরোধের বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সভা ডাকা হয়েছিল কুমার সিং হল-এ। সোমনাথ লাহিড়ী ওই সভায় পরিষ্কার বলেন, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয় সিং নাহার আর কালীপদ মুখোপাধ্যায়—এই তিনজন চাইলেই কলকাতায় দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আচার্য কৃপালনী ওই তিনজনের অভিমত জানতে চান। প্রথমে বিপিনবিহারী এবং পরে অন্য দুজন প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁরা তাঁদের কর্মীদের সরিয়ে নেবেন। কলকাতার অবস্থার এর পরই উন্নতি হতে শুরু করে।(সাক্ষাৎকার, ১৭: ২: ৯৩)

৩। *Amrita Bazar Patrika*, Sept 4, 1947

৪। 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৫৪

৫। *Amrita Bazar Patrika*, Sept. 4, 1947

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং শান্তির প্রতিশ্রুতি দেন। ৪ সেপ্টেম্বর উত্তর কলকাতার পুলিসরা 'গান্ধীজীর আহ্বানের প্রতি' সহমর্মিতা জানিয়ে ২৪ ঘন্টা অনশন করেন। মহাত্মার অনশনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার নেতারা অস্বস্তিতে পড়ে যান। মহাসভা বিবৃতি দেয় : বাইরে থেকে আমদানি করা লোকেরা (outside elements) কলকাতার বাঙালিদের বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।[১]

অবাঙালি হিন্দুদের মদত দাঙ্গার পিছনে রয়েছে এবং বাঙালি হিন্দু নেতাদের তার ওপর আর নিয়ন্ত্রণ থাকছে না, এমন একটা ইঙ্গিত এ থেকে পাওয়া যায়। অবস্থাটা পরিষ্কার ধরা পড়েছে 'শনিবারের চিঠি'-র (আষাঢ় ১৩৫৪) একটি মন্তব্যে : 'মনে হয় এখন আর নিছক শিক্ষা দেওয়ার অথবা প্রতিশোধ লওয়ার স্পৃহা হইতে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে না। অনভ্যস্তরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটা দারুণ নেশায় তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। এ নেশা বর্বর মানুষের আদিমতম নেশা, পরস্পর রক্ত দর্শনের নেশা।'

মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে যাদের কাজে লাগানো হয়েছিল, তারাই এখন লাগামহীন খুনোখুনিতে মেতে উঠেছে; অথচ স্বাধীনতা যখন এসেই গেছে, তখন এতটা বাড়াবাড়ি আর নেতারা প্রয়োজন মনে করছেন না। একটি কট্টর হিন্দু পত্রিকা খোলাখুলিই বলে : 'কলিকাতার হিন্দুপক্ষ কিছুদিন হইল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং কোন কোন অঞ্চলের মুসলমানদিগের মধ্যে ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' কিন্তু এখন 'সাম্প্রদায়িক রক্তারক্তির আর কোনও সার্থকতা নাই। কেন না পাকিস্তান কায়েম হইয়া গিয়াছে।'[২]

সার্থকতা না থাকলেও যে দাঙ্গা ঘটছে, তার জন্যে দায়ী করা হচ্ছে 'সমাজে শৃঙ্খলা থাকা যাহাদের স্বার্থের বিরোধী', সেই শক্তিকে। কিন্তু কে সেই শক্তি? কোন্ সে স্বার্থ? দাঙ্গার কেন্দ্রে রয়েছে বড়বাজার; ১ সেপ্টেম্বর বড় আকারে দাঙ্গা শুরু হয়েছে বড়বাজার অঞ্চল থেকেই, একটি গুজবকে কেন্দ্র করে। বড়বাজারের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একটা মদত এই দাঙ্গায় ছিল, এমন মনে করার তাই কারণ আছে। এদের লক্ষ্য মুসলমানদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে তাদের দোকানপাট—ব্যবসাকেন্দ্রগুলো দখল করা। সঙ্গে আছে আরও কিছু স্বার্থান্বেষী শক্তিও, যেমন হিন্দু বস্তিমালিক। তাদের স্বার্থ হল মুসলমান বস্তি ভেঙে দিয়ে সেই জায়গায় বেশি ভাড়ায় হিন্দু ভাড়াটে বসানো। বেছে বেছে মুসলমান বস্তির ওপর আক্রমণ তাই এই সময় একটা নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। বেলেঘাটার মিয়াবাগান, এন্টালির মতিঝিল, শ্যামবাজারের নিকাসিপাড়া এবং আরও অনেক বস্তি থেকে মুসলমানরা উচ্ছেদ হয়ে যায় এই সময়। রাজাবাজারের সাহেববাগান বস্তি নিয়ে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটি সমীক্ষাতেও (মেময়ার ৫, ১৯৫৮) এই বিষয়টা ধরা পড়েছে। বৈঠকখানার দপ্তরি সমাজ থেকেও মুসলমানরা উচ্ছেদ হতে শুরু করে এই সময়।[৩] উক্ত সমীক্ষাটি করেছিলেন উমা গুহ।

১। *Amrita Bazar*, Sept. 3, 1947; *Calcutta Municipal Gazette*, 6-27 Sept , 1947

২। 'হিন্দু', ৬ ভাদ্র ১৩৫৪

৩। ১৯৪৬-৪৭ সালে কলকাতার জনসংখ্যায় মুসলমানরা ছিলেন ২৩ শতাংশ; ১৯৫১-তে এটা নেমে গিয়ে দাঁড়ায় ১২ শতাংশ। [M K.A Siddiqui, *Muslims of Calcutta*, p 19]

টানা এক বছর ধরে ক্রমাগত দাঙ্গায় ক্লান্ত মানুষ। তাদের উত্তেজিত করার জন্যে, তাদের কাছে দাঙ্গাকে প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্যে নির্বিচারে গুজব এবং প্যানিক ছড়ানো হতে থাকে। মুসলমানরা ব্রিটিশের সাহায্যে ডিনামাইট দিয়ে কলকাতাকে উড়িয়ে দেবে— বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এই প্রচার। একদিন দুপুরে গুজব ওঠে, ইসলামিয়া (মৌলানা আজাদ) কলেজে মুসলমান ছাত্রদের ধরে ধরে কেটে ফেলা হচ্ছে।[১] 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, দাঙ্গার কয়েকদিন আগে থেকে হিন্দিতে লেখা হাজার হাজার লিফলেট ছড়ানো হয় শহরে; অত্যন্ত উত্তেজক ভাষায় প্রচার চালানো হয় কয়েকটি অঞ্চল থেকে। একটি প্রচার ছিল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হিন্দুদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। পত্রলেখক লিখেছেন, দাঙ্গাওয়ালারা ভেবেছিল, তারা অ-মুসলিম জনসাধারণের সমর্থন পাবে; কিন্তু ঘটনা তা হয়নি। সাধারণ লোকে মোটেই এ দাঙ্গা পছন্দ করেনি; হঠাৎ করে হাঙ্গামা শুরু হওয়ায় তারা বরং বিমূঢ় হয়ে যায়।[২]

সুপরিকল্পিত এইসব প্রচারে আর গুজবে কলকাতার মুসলমানরা সন্ত্রস্ত হয়েছিল এবং মুসলমান গুণ্ডারা যদিও তখন কোণঠাসা হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় তারাও মারদাঙ্গা শুরু করে। হাঙ্গামা বাঁধানোর পরিকল্পনা মুসলমানদের তরফেও ছিল। জুলাই মাসেই গভর্নর গোপন নোটে লিখেছিলেন, লীগ নেতারা আর দাঙ্গায় আগ্রহী নয়; কিন্তু গুণ্ডারা তৈরি আছে। নেতারা ইতিমধ্যে ঢাকায় চলে যাবেন, আর গুণ্ডারা হাঙ্গামা শুরু করবে : Some Muslim elements may get out of hand.[৩]

শান্তি মিছিলের ওপর মুসলমানদের আক্রমণের দু একটি ঘটনা এই সময় ঘটেছিল যেমন কলুটোলা স্ট্রীটে ছাত্রীদের একটি মিছিলের ওপর গুণ্ডাদের আক্রমণ।[৪] মুসলমানরা কলকাতায় ব্যাপক হাঙ্গামার ষড়যন্ত্র করছে, এমন একটা প্রচার খুবই জোরদার হয়ে উঠেছিল জুলাইয়ের শেষ দিক থেকেই। হরেন ঘোষ এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছিলেন বলেই তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, এমন একটি প্রচারও ছড়িয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে।[৫] অগাস্টের গোড়া থেকে প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভা বারবার আবেদন জানিয়ে বিশেষ সেনাবাহিনী মোতায়েন করার ব্যবস্থা করে। কলকাতার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নেহরুও।[৬]

কিছুটা কোণঠাসা হয়ে গেলেও মুসলমান দুর্বৃত্তরা যে এই সময় নিষ্ক্রিয় ছিল না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তিনটি মর্মান্তিক হত্যা। শচীন্দ্র মিত্র ছুরিকাহত হয়েছিলেন ১ সেপ্টেম্বর; ৩ তারিখে শহিদ হলেন স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুশীল দাশগুপ্ত; তিনজনেই গান্ধীবাদী কর্মী; শান্তি অভিযানে বেরিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন গুণ্ডাদের হাতে। বীরেশ্বর ঘোষ নামে আর-এক শহিদের নামও পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়।

১। মৌখিক সূত্র : বিরাজমোহন ঘোষ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
২। *Amrita Bazar Patrika*, Sept 5, 1947, Letter by S L Ghosh
২। *The Tranfer of Power*, ed by Mansergh, Vol. XII, pp 224-25
৪। মৌখিক সূত্র : বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৫। মৌখিক সূত্র : অলোক ঘোষ, দাঙ্গায় নিহত হরেন ঘোষের পুত্র
৬। Mansergh, *op cit*, Vol. XII, pp 283-84, 445

স্মৃতীশ (মানিক) বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে হুগলির একটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিরিশের দশকের শেষে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন; পরে কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দেন। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের এক উদ্যোগী কর্মী ছিলেন তিনি। তাঁরই উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়; প্রদর্শনীটি ১ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করা হবে কথা ছিল; দাঙ্গার কারণে সম্ভব হয়নি, ৩ সেপ্টেম্বর নিজেই শহিদ হয়ে ইতিহাস হয়ে গেলেন স্মৃতীশ।[১]

সুশীল দাশগুপ্ত-র সঙ্গেও বিপ্লবী দলের যোগাযোগ ছিল; পরে তিনি কংগ্রেসী হন এবং ১৯৩০-এ আরামবাগে কর-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। পার্ক স্ট্রীট এবং সার্কুলার রোডের মোড়ে ছুরিকাহত হয়েছিলেন সুশীল; তাঁর মৃত্যু হয় ১১ সেপ্টেম্বর।[২]

শচীন্দ্র-স্মৃতীশ-সুশীল-বীরেশ্বর—আত্মোৎসর্গের প্রতীক হয়ে উঠেছিল তখন এই নামগুলি কলকাতার মানুষের কাছে—একাধিক সভা হয় এঁদের স্মরণে। ১৬ সেপ্টেম্বরের একটা সভায় সভাপতিত্ব করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শচীন্দ্র স্মরণে একটি গান লেখেন সজনীকান্ত দাশ।[৩]

শান্তি অভিযান

পরিস্থিতিটা গুণ্ডা-দুষ্কৃতীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর এখন আর রাশ টানতে পারছিলেন না নেতারা; গান্ধীর অনশন তাদের একটা সুযোগ করে দিল। মহাত্মাজীর প্রাণ বাঁচাতে হবে, কলকাতায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে বলে জোরদার একটা শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হল। 'দাঙ্গাবাজী চলবে না, গান্ধীজীকে বাঁচাতে হবে' ধ্বনি দিয়ে এক বিশাল মিছিল পথ পরিক্রমা করে ৩ সেপ্টেম্বর। অঞ্চলে অঞ্চলে পাহারা বসানো হয় শান্তি কমিটির সদস্যদের দিয়ে; দু দিন আগেও যারা দাঙ্গা করেছে, তাদেরও ঢুকিয়ে নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় শান্তিসেনায়। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড আর হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ডের মতো দাঙ্গাবাজ দলও যোগ দেয় শান্তিসেনায়। নারীদের নিয়ে গঠিত ঝাঁসি রানী ব্রিগেড কুচকাওয়াজ করে শহরের রাস্তায়।[৪] নারীদের শান্তি মিছিলের যে ছবি সরোজ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে দেওয়া আছে, তা সত্যিই দেখার মতো। রাস্তার দু পাশে অগণিত মানুষ দাঁড়িয়ে দেখছেন সে মিছিল। আর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রাজাবাজারের মোড়ে পাহারারত শান্তিসেনা—দুই সম্প্রদায়ের মানুষই আছেন। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার সঙ্গে এই পর্বের দাঙ্গার একটা স্মরণীয় পার্থক্য : দাঙ্গার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ রচিত হয়েছিল এবং সেই প্রয়াসে সামিল হয়েছিলেন সাধারণ শান্তিপ্রিয়

১। *Amrita Bazar Patrika*, Sept 5, 1947

২। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সুশীল দাশগুপ্ত-র পরিচিতি

৩। মৌখিক সূত্র : অংশুরানী মিত্র, সুধী প্রধান

৪। সরোজ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২-১৪

মানুষ। দাঙ্গা থেমে যাবার পর স্বাধীনতা পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : 'এবারকার দাঙ্গা প্রতিরোধের সকল কৃতিত্ব শান্তিকামী জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া ছাত্র ও যুবকদের।'[১]

৪ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। ওই দিনই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের একটি দল বেলেঘাটায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে একটি লিখিত বিবৃতিতে প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁরা শহরের শান্তি বিঘ্নিত হতে দেবেন না। স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন, হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে এন.সি.চ্যাটার্জী এবং ডি.এন.মুখার্জী, 'দেশ দর্পণ'পত্রিকার সম্পাদক সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিব এবং পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী আর. কে. জৈলকা। বিবৃতিতে লেখা হয় : We shall never again allow communal strife in the city and shall strive unto death to prevent it .[২]

ওইদিনের আর একটি নাটকীয় ঘটনা ছিল একদল গুণ্ডার অস্ত্র সমর্পণ। গান্ধীজীর কাছে তাদের নিয়ে গিয়েছিলেন রামমনোহর লোহিয়া। গুণ্ডারা মহাত্মার কাছে তাদের দোষ স্বীকার করে স্টেনগান, হ্যান্ডগ্রেনেড এবং আরও কিছু অস্ত্র তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে। এরপর আরও কয়েকটি দল একইভাবে অস্ত্র সমর্পণ করে যায়।[৩]

সেই দিনই রাত ৯-১৫-এ গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর ময়দানে এক বিশাল জনসভায় তিনি বলেন, শান্তির প্রতিশ্রুতি পেয়েই তিনি অনশন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন; কলকাতায় শান্তি বিঘ্নিত হলে তাঁকে আবার 'আমরণ অনশন' শুরু করতে হবে।[৪]

মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের যে আদর্শে গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, তা তিনি সত্যিই কলকাতায় অর্জন করতে পেরেছিলেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। গান্ধীর এক জীবনীকারও এ প্রশ্ন তুলেছেন।[৫] কিন্তু মহাত্মার ভাবমূর্তি নিঃসন্দেহে একটা প্রচণ্ড শক্তির মতো কাজ করছিল; হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিকামী মানুষের কাছেই গান্ধীজী হয়ে উঠেছিলেন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আদর্শের এক জাগরিত প্রতীক। দলমত নির্বিশেষে মানুষ মিছিল করেছে 'গান্ধীজীকে বাঁচাতে হবে' ধ্বনি দিয়ে। গুণ্ডা-দুর্বৃত্তরাও কেউ কেউ তাঁকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বিজয় সিং নাহার জানিয়েছেন, বেলেঘাটায় তাঁর চোখের সামনে এক উগ্রপন্থী যুবক হঠাৎ পকেট থেকে রিভলবার বের করে নামিয়ে রাখে এবং গান্ধীর পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, সে আর দাঙ্গা করবে না। গান্ধীর ওপর আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিল যে স্থানীয় যুবকটি, সেও অস্ত্র সমর্পণ করে। ঘটনাটা অবশ্যই প্রতীকী; কারণ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের একটা খুব সামান্য অংশই জমা পড়েছিল।

কোন কোন পত্রিকায় এই ঘটনাকে 'অলৌকিক' বলে বর্ণনা করা হলেও গান্ধী নিজে কিন্তু তা বলেননি। তাঁর পরিষ্কার স্বীকারোক্তি ছিল : অহিংসাতত্ত্ব সফল হয়েছে বলা

১। ঐ, পৃ. ৪১৪

২। *The Statesman*, Sept. 5, 1947

৩। *Calcutta Municipal Gazette*, 6-27 Sept 1947, pp 116, d-c *The Statesman*, Sept 5, 1947

৪। *The Statesman*, Sept. 7, 1947

৫। Krishna Kripalani, *Gandhi A Life*, p 182

যাবে না; এটা এখনও পরীক্ষাধীন। I have never felt that my Ahimsa had failed in Noakhali; nor can it be said that it has succeeded. It is on trial. আর একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই ঘটনা অলৌকিকও নয়, আকস্মিকও নয়। হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক মিলনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল বলেই দাঙ্গা ঠেকানো সম্ভব হয়েছে; এরপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গান্ধী অবশ্য 'ঈশ্বরের করুণা'র কথা বলেন।[১]

হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল—এই মন্তব্যটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বের দাঙ্গার পিছনে আমরা দেখেছি, জনসমর্থন ছিল না। শান্তি সেনার আন্দোলন সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাঁরা সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। পারস্পরিক মিলনেচ্ছা কতদূর ছিল, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে; কিন্তু দাঙ্গা বন্ধ হোক—এই বাসনাটা ছিল আন্তরিক। গান্ধীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ, শান্তি সেনার আন্দোলন নিঃসন্দেহে এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছিল; কিন্তু দাঙ্গা যে থামানো গেল, তার সবচেয়ে বড় কারণ : দাঙ্গার বাস্তব প্রয়োজনটাও সাময়িকভাবে ফুরিয়ে আসছিল।

মুসলমানদের যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; এখন আর দাঙ্গার প্রয়োজন নেই—এই রকম একটা চেতনা দাঙ্গার সংগঠকদের মধ্যেও এসে গিয়েছিল; তারাই উদ্যোগী হয়ে গুণ্ডাদের দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করিয়ে দাঙ্গার সমাপ্তি ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে। বেলেঘাটায় গান্ধী শিবিরের ওপর আক্রমণ বন্ধ করার জন্য দাঙ্গার এক মুখ্য সংগঠকেরই সাহায্য নিতে হয়। খিদিরপুর অঞ্চলের একজন বাসিন্দা জানাচ্ছেন, প্রতিরক্ষার নামে প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা; পরিকল্পনা ছিল, হিন্দু পাড়ার ভেতরে একটি মুসলমান বস্তি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। ইতিমধ্যে গান্ধী সভা করে যান। নেতাদের চাপে দাঙ্গাওয়ালারাও কেউ কেউ শান্তি কমিটিতে যোগ দেয়। অবশেষে স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষকের বিশেষ অনুরোধে তারা মুসলমান বস্তি ধ্বংস করে দেবার পরিকল্পনা ত্যাগ করে। বোমা বাঁধতে গিয়ে চোখ নষ্ট হয়েছে এমন একজন যুবক তখন অস্ত্রগুলি গান্ধীর কাছে সমর্পণ করে আসে।[২]

ছেচল্লিশের দাঙ্গার ওপর তদন্ত কমিশন ইতিমধ্যে তুলে দেওয়া হয়েছিল; সব দল মিলেই এই সিদ্ধান্ত নেয়। তদন্ত কমিশন অভিযোগ করেছিল, সাক্ষীদের ভয় দেখানো হচ্ছে এবং কোন দলই কমিশন বজায় রাখতে আগ্রহী নয়।[৩] টানা এক বছরের এই রক্তক্ষয়ী ইতিহাসটাকে চাপা দিয়ে রাখাটাই তখন জরুরি হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে। কারণ তারা যা চেয়েছিল, তা পাওয়া হয়ে গেছে; বুড়ো খোকাদের ভারত ভেঙে ভাগ করার খেলা সাঙ্গ হয়েছে। এক বছরের ক্রমাগত রক্তপাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে হতশ্রী কলকাতা। অঞ্চলে অঞ্চলে তখনও বিচ্ছিন্ন উত্তেজনা। ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিলে হাঙ্গামা; কলকাতায় মহরমের দিন পুলিসের গুলিতে পাঁচজনের মৃত্যু। এরপর আরও বীভৎস দাঙ্গা শুরু হবে ঢাকা-বরিশাল-চট্টগ্রামে; উদ্বাস্তু স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে মহানগরীর রাজপথ।

সে আর এক ইতিহাস।

১। *Amrita Bazar Patrika*, Sept. 7, 1947; 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৫৪

২। মৌখিক সূত্র : ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর; গোপাল মুখোপাধ্যায়, বউবাজার

৩। Mansergh, *op cit*, Vol. XI, pp 894 -95; Vol. XII, p 126

এই অধ্যায়ের সূচনায় কৃষণ চন্দরের গল্পের উদ্ধৃতিটি কমলেশ সেন সম্পাদিত 'দাঙ্গা বিরোধী গল্প' থেকে নেওয়া।

হিংসার কলকাতা

প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিতে

আবদুল মোহাইমেন, কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন, থাকতেন পার্ক সার্কাসে। পরবর্তী কালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হন; বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। 'দুই দশকের স্মৃতি' গ্রন্থে কলকাতা দাঙ্গা.. বিশদ বিবরণ দিয়েছেন; তাঁর মতে :

'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কার বিরুদ্ধে, লীগ এটা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা না করায় হিন্দুদের ধারণা হয়, 'এই ডাইরেক্ট এ্যাকশন তাদের বিরুদ্ধেই চালানো হবে। তাই ১৬ই ... অগাস্টের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তারা মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে সক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হয়।' ১৬ তারিখ সকালেই হাওড়া, বেলেঘাটা, চিৎপুর, গড়িয়াহাটা অঞ্চলে বেশ কয়েকজন মুসলমান গোয়ালা এবং সবজিওয়ালা আক্রান্ত হন। ময়দানমুখী মিছিলের পথে এইসব খবর আসে এবং উত্তেজনা ছড়ায়। ওয়েলিংটনের মুখে, লেখক দেখেন, হঠাৎ এক ওড়িয়া রিকশাওয়ালার মাথা ফাটিয়ে দিল কয়েকজন বিহারী মুসলমান। ময়দানের সভাতেও জনতা খুব উত্তেজিত ছিল। আহত মুসলমানদের রক্তে ভেজা পোশাক দেখিয়ে জনতা জানতে চায়, মুসলমানদের রক্ষার জন্যে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে!

পার্ক সার্কাসে ফিরে এসে লেখক দেখতে পান, হিন্দু বাড়ির দরজা ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে, হিন্দুর দোকান লুঠ হচ্ছে। লোকে আলমারি ভেঙে চিনি, মসলা, মাখন, জেলি লুঠ করে নিচ্ছে। হাঙ্গামা চলতে থাকলে জিনিস পাওয়া যাবে না ভেবে লেখক নিজেও 'সের দশেক চাল' তুলে নেন। পরের দিন সকালে পাড়া ঘুরে তিনি দেখেন, হিন্দুদের দোকান 'সবই লুঠ হয়ে গেছে। হিন্দু বাড়িগুলোর অধিকাংশেরই দরজা ভাঙ্গা।' লেখক কয়েকজন হিন্দুকে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে সাহায্য করেন; তাঁদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাস। তৃতীয় দিন লেখকের চোখের সামনেই পিটিয়ে মারা হয় একজন শিখকে।

পার্ক সার্কাস ময়দানে ত্রাণ শিবির খোলা হলে লেখক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সেখানে কাজ করেছিলেন। সেই সময় তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী শোনেন। বাগমারি অঞ্চলের একটি দরজি পরিবার এসেছিল—দরজি লোকটির স্ত্রীর ওপর নৃশংস পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল, কয়েকদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মায়ের সামনে শিশুকে দেয়ালে আছাড় মেরে হত্যা করা হয়েছে, এমন কয়েকটি ঘটনার কথাও তাঁরা শোনেন। মোহাইমেন লিখছেন, 'এইসব শুনে তখন আমি এতই সাম্প্রদায়িক চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে আমার সমস্ত শুভবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। ঐ মুহূর্তে আমি কোন হিন্দুকে হাতের কাছে পেলে নির্ঘাৎ খুন করতে পারতাম।' তাঁর এই সাময়িক 'মানসিক বিকৃতি'-র কথা ভেবে পরে তিনি লজ্জিত হতেন।

শান্তি মল্লিক (আচার্য), অধ্যাপিকা, সরোজিনী নাইডু কলেজ। বেনিয়াপুকুরের বাসিন্দা। দাঙ্গার সময় বয়স ছিল মাত্র ১৬; কিন্তু তাঁর নিজের ভাষায় : 'ওই কদিনের অভিজ্ঞতা আমার বয়স কয়েক বছর বাড়িয়ে দিয়েছিল।' ২৮.৭.৯২ তিনি আমাদের শোনান তাঁর অভিজ্ঞতার কথা :

ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়তাম। মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল কিন্তু দাঙ্গার কিছুদিন আগে থেকেই ওদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করি; শুনতাম, প্রতি শুক্রবার নাকি ওদের 'পলিটিক্যাল নামাজ' হয়; তখনও বিষয়টাকে গুরুত্ব দিইনি।

১৬ অগাস্ট আমাদের পাড়ায় কোন গোলমাল হয়নি; সন্ধ্যেবেলা ছাদ থেকে দেখেছিলাম, মল্লিকবাজারের বস্তি জ্বলছে। তখনই ভয় ধরে মনে। পরের দিন একদল মুসলমান পাড়ায় ঢোকে; শোনা যায় হিন্দু বাড়ি আক্রান্ত হবে। আমাদের পাড়াতেই স্যালভেশন আর্মির একটা সেন্টার ছিল। বাবা ওদের কাছে সাহায্য চেয়ে পেলেন না। ইতিমধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে যাওয়ায় আমাদের এক মুসলমান প্রতিবেশী বাবাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যান। বাবা ফিরছেন না দেখে আমরা দুশ্চিন্তায় আছি। অবশেষে ঠিক হয়, আমরা পাশেই আমাদের পিসিমার বাড়িতে চলে যাব; কারণ ও বাড়ি অনেক বেশি সুরক্ষিত।

পিসিমার বাড়িতে বসেই টের পাই, আমাদের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র লুঠ হল। তারপর পিসিমার বাড়ির ওপরও আক্রমণ হল। ছুরি শান দিয়ে ওরা ভয় দেখাতে লাগল। আমরা গয়নাগাটি সব খুলে দিলাম। তবে কেউ আমাদের গায়ে হাত দেয়নি। পাড়ার একজন বন্দুক বের করেছিলেন বলে তাকে একটা ছুরির কোপ মারে; কিন্তু হত্যার ঘটনা কিছু ঘটেনি। আহত ব্যক্তিটি ছিলেন কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের জামাই। পিসিমার বাড়ি থেকে আমরা কিরণবাবুর বাড়িতে যাই সেখান থেকে শিখ ভলান্টিয়াররা আমাদের ভবানীপুরে আত্মীয়র বাড়িতে পৌঁছে দেয়। পথে দেখেছিলাম, ঠেলাগাড়ি করে মড়া নিয়ে যাচ্ছে—গোয়ালাদের মৃতদেহ। ভবানীপুর থেকে পুলিসের সাহায্যে আমরা শ্যামবাজার যাই। সেখানে বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। বেশ কয়েকমাস আমরা বাড়িছাড়া হয়েছিলাম। ভিক্টোরিয়া কলেজের মেয়েদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা হয়েছিল শুনেছি। কলেজের দারোয়ান খুন হয়। কলেজ অনেকদিন বন্ধ ছিল; দক্ষিণ কলকাতার বেলতলা স্কুলের বাড়িতেও কিছুদিন ক্লাস হয়। আমাদের পাড়ার উল্টো দিকে কিছু ইহুদী পরিবার ছিলেন; তাঁরা কয়েকজন হিন্দুকে আশ্রয় দেন।

বলাই দত্ত, এখন বয়স ৮৪; পার্ক সার্কাসের কড়েয়া অঞ্চলের বাসিন্দা। দাঙ্গার ফলে গৃহচ্যুত হন। ১৯.৮.৯২ আমরা শুনলাম তাঁর অভিজ্ঞতা :

১৬ অগাস্ট সকালেই পাড়ায় হাঙ্গামা শুরু হয়। একদল মুসলমান দোকানপাট ভাঙচুর করতে শুরু করে। হিন্দুদের হুমকি দেয়। আমাদের বাড়ির উলটো দিকেই কড়েয়া থানা; পুলিসের সাহায্য চাইতে গিয়ে শুনলাম, সাহায্য পাওয়া যাবে না, কারণ— 'সুরাবর্দি সাহেবের হুকুম নেই।' আমাদের প্রতিবেশী কাদেরসাহেব ছিলেন একসাইজ কমিশনার। তিনি মুসলমান জনতাকে বারবার বাধা দিয়ে হটিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তৃতীয় দিনে আর সাহস পেলেন না; আমাদের বললেন, আপনারা চলে যান—আর রাখতে

পারব না। আমরা কয়েকটা হিন্দু পরিবার তখন পুলিসের গাড়িতে করে ভবানীপুরে চলে যাই। বেশ কয়েকমাস ঘরছাড়া ছিলাম।

দাঙ্গার যে দৃশ্য দেখেছি, ভুলতে পারি না। বিধবা রমণীর একমাত্র মেয়ে, তার মুণ্ডু কেটে কাটা মুণ্ডুটা নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রক্ত ছেটানো হচ্ছে, নিজে দেখেছি সে দৃশ্য। শচীন দত্ত বলে এক ভদ্রলোকের নাতনিকে তুলে নিয়ে যায়; খোঁজ পাওয়া যায়নি। ভবানীপুরে গিয়ে শুনেছিলাম, মুসলমান হত্যার কথা। হিন্দু আর শিখরা মুসলমানদের মেরে ড্রেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

গোলাম কুদ্দুস, কবি, সাহিত্যিক, তখন কমিউনিস্ট পার্টির 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১২.৯.৯২ তিনি শোনালেন তাঁর অভিজ্ঞতা :

১৬ অগাস্ট দুপুর থেকে হাঙ্গামার খবর আসছিল। কম্‌রেড রণেন সেন আমাকে নিয়ে মেটিয়াবুরুজে গেলেন শ্রমিকদের অবস্থা দেখার জন্যে। ওখানে শ্রমিকরা বললেন, কোন চিন্তা নেই—আপনারা তাড়াতাড়ি ফিরে যান। ট্যাক্সিতে করে ফিরছি, কালীঘাট ব্রিজে ট্যাক্সি আটকে জানতে চাইল—ভেতরে মুসলমান আছে কি না। আমার ধুতি পরা ছিল—বেঁচে গেলাম।

পরের কয়েক দিন 'স্বাধীনতা' অফিসেই আটকে ছিলাম—দাঙ্গার খবর পাচ্ছিলাম টেলিফোনে। আমাদের অফিসের সামনেই এক মুসলমানকে পিটিয়ে মারা হয়। অবস্থা কিছুটা শান্ত হলে পার্ক সার্কাসের আহিরীপুকুর অঞ্চলে গিয়ে হিন্দু নিধনের কাহিনী শুনি। ম্যানহোলের মধ্যে এক নারীর মৃতদেহ নিজে দেখেছি। গুণ্ডারা পাড়ার হিন্দুদের একেবারে শেষ করে দিয়েছিল; শুধু বাঁচিয়ে রেখেছিল একটা নাপিতকে। সে সব জানত, কিন্তু প্রাণের ভয়ে কিছু বলেনি।

লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের ত্রাণ শিবিরে গিয়ে শুনি, মুসলমানরা বলছে—যে হিন্দুরা তাদের বাঁচিয়েছে তাদের মধ্যে 'খোদা' আছেন। কী আশ্চর্য, হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যেও একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখেন ননী ভৌমিক, আশুতোষ কলেজের ত্রাণ শিবিরে গিয়ে। আমাদের দু জনের রিপোর্ট 'স্বাধীনতা'-য় একই দিনে একই পাতায় ছাপা হয়। ননী ভৌমিকের লেখায় ছিল—হিন্দুরা বলছে, মুসলমানদের মধ্যে 'ভগবান' আছেন, তাই তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছে।

পঞ্চানন ঘোষাল, গোয়েন্দা পুলিসের উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন, ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরেছেন; 'পুলিশ কাহিনী' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে দাঙ্গার বিষয়ে লিখছেন :

দাঙ্গার কিছু আগেই থানাওয়ারি 'সিভিক গার্ড' পদটি বাতিল করা হয়। থানার ইনচার্জরা বেশির ভাগই হিন্দু ছিলেন বলে প্রতি তিনটি থানার জন্যে ডি ডি (ওয়ান) নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করে সেই পদে হিন্দু অফিসারদের নিয়োগ করা হয় আর থানার ইনচার্জ করে দেওয়া হয় মুসলিম অফিসারদের। এছাড়া বিহার, পাঞ্জাব থেকে অতিরিক্ত মুসলিম অফিসার এবং বিশেষ পাঠান বাহিনী নিয়ে এসে লীগ সরকার পুলিসকে সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে নিয়ে আসে। লালবাজারে বিশেষ কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা এই সময়ই চালু হয়; থানার দারোগারা কন্ট্রোল রুমের নির্দেশাধীন ছিল; পুলিশকে

নিষ্ক্রিয় করে রাখার জন্যই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। মধ্য কলকাতার জন্যে ডি. সি. পদ তৈরি করে একজন মুসলিম অফিসারকে সেই পদে নিয়োগ করাও ছিল এই পরিকল্পনার অঙ্গ।

বাঙালি মুসলমানরা 'উসকানি সত্ত্বেও' দাঙ্গায় সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়নি; যদিও তারা দারুণভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। হিন্দুরা পাল্টা দিতে পারে, এটা লীগ সরকার বুঝতে পারেনি। তাই ১৬ তারিখে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের আক্রান্ত হওয়ার সংবাদে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর ফজলুল হক ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক নেতাকে সেদিন দাঙ্গা ঠেকানোর জন্যে রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি।

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিকামী মানুষই পবস্পরকে আশ্রয় দিয়েছেন। সম্প্রদায়ের ভেতর সেদিন ধনী-নির্ধন ভেদ ছিল না। টেরিটিবাজারে কিছু চীনা পরিবার হিন্দুদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। টালিগঞ্জে শিখরা উদ্ধার করেন কয়েকজন আক্রান্ত নারীকে। একজন হিন্দু পুলিস অফিসার তাঁর মুসলমান সহকর্মীর স্ত্রীকে কপালে সিঁদুর দিয়ে হিন্দু সাজিয়ে রক্ষা করেন। একাধিক ক্ষেত্রে লেখক নিজে গুণ্ডাদের মোকাবিলা করেছেন।

ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর পাড়ায় পাড়ায় বেকার-লোফার ছেলেরা 'প্রাইভেট পুলিশ' হয়ে ওঠে; তারাই হয় অঞ্চলের রক্ষাকর্তা। পুলিসের খাতায় তারা পরিচিত হয় 'প্রতিরোধী দল' বলে; পরবর্তী কালে এই যুবকরা সমাজে একটা সমস্যা হয়ে উঠেছিল।

নিমাইচাঁদ দত্ত, মধ্য কলকাতায় ফিয়ার্স লেনের বাসিন্দা, সাগর দত্তের পৌত্র; দাঙ্গায় পরিবারটি দারুণভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। ২৩.৩.৯৩ আমরা শুনেছি সে-কাহিনী :

দাঙ্গার কয়েকদিন আগেই বাইরে থেকে একটা দল এসেছিল—কালো প্যান্ট, কালো শার্ট, মাথায় কালো ব্যান্ড। দাঙ্গাটা এরাই শুরু করে। ১৬ তারিখ সকালেই ছাদ থেকে দেখেছিলাম—আশপাশের বাড়ির ছাদে ছুরি শান দেওয়া হচ্ছে। তারপর শুরু হল দোকান লুঠ আর বাড়ির দরজা ভাঙা। আমরা চারতলার ছাদে চলে গিয়েছিলাম। তারপর প্রতিবেশী ছাম্মা মিয়ার সাহায্যে একটার পর একটা ছাদ পার হয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ-এ পৌঁছে যাই। সেখানে দেখেছিলাম ট্রাকভর্তি মড়া।

মেডিকেল কলেজে আমরা আশ্রয় পাই—সেখানে আরও অনেক পরিবার এসেছিলেন, যেমন সত্যব্রত সেন, জগন্নাথ দে—এরা দুজনেই ছুরি খেয়েছিলেন। জবাকুসুমের মালিককে হত্যা করা হয়েছে—এই খবরও সেখানে পাই। পথে দেখেছিলাম, আতরের দোকান লুঠ হয়েছে—চড়া গন্ধ বাতাসে। 'জবাকুসুম' আলতার লাল আর রক্তের লাল মিশে গেছে।

হিদারাম ব্যানার্জী লেনে এক আত্মীয়র বাড়িতে আমরা কিছুদিন ছিলাম; তারপর প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে গিয়ে উঠি। চার বছর পরে বাড়ি ফিরে দেখি, সব কিছু ভেঙে তছনছ, দামি জিনিসপত্র সব লুঠ হয়ে গেছে। রাস্তায় মড়া পড়ে থাকার দৃশ্য এখনও মনে পড়ে। আর্মির লোকজন আমাদের বাড়ির বাচ্চাদের চোখ ঢেকে দিয়েছিল, ভয় পাবে ভেবে। আমাদের অঞ্চলে ও সাগর দত্ত লেনে মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয়েছিল বলেও শুনেছি।

দাঙ্গা

ধ্বংসের দায়ভাগ আর আমাদের দায়

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের দাঙ্গায় ১৯৪৭-এর অগাস্ট পর্যন্ত হিসাবে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় ১৭ হাজার মানুষ; সময়সীমা ১৯৪৮ পর্যন্ত টেনে পাঞ্জাবের হিসেব যোগ দিলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার। দাঙ্গার ভয়াবহতা পুরো বুঝতে হলে তার সঙ্গে যোগ দিতে হবে আরও ৬০ লক্ষ মুসলমান, আর ৪৫ লক্ষ হিন্দু এবং শিখ বাস্তুহারা পরিবারের সংখ্যা।[১] ১৯৫০ পর্যন্ত হিসেব নিলে মৃতের সংখ্যা আরও কয়েক লক্ষ বাড়বে; প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দু পরিবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন ওই সময়ের মধ্যে।

এই হিসেব সম্পূর্ণ নয়, আর পুরো হিসেব কোনদিন পাওয়াও যাবে না। কলকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের ১৯৪৬-৪৭ সালের বার্ষিক রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছিল, বিগত বছরে শহরে মৃত্যুর যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নয়; কারণ দাঙ্গার পর গাদা গাদা মড়া যখন সৎকার করা হয়েছে তার কোন হিসাব রাখা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৭-৪৮-এর পাঞ্জাব দাঙ্গায় কত মানুষ মারা গিয়েছিলেন তার পুরো হিসেবেও পাওয়া যায় না; কারণ অমৃতসর থেকে লাহোর বা লাহোর থেকে অমৃতসর—কখনও কখনও পুরো একটা ট্রেনই এসেছিল মৃতদেহ বোঝাই হয়ে।

ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গায় বিমূঢ় এক বিদেশী লিখেছিলেন, রণাঙ্গনের হাসপাতাল আমার ভালোই দেখা আছে; কিন্তু যুদ্ধও এরকম হয় না। ১৯৪৬-৪৭-এর পুরো ছবিটা পেলে তিনি কি বলতেন, আমরা জানি না। অমানুষিক সেই বীভৎসতার পুরো রূপটা হয়ত আমরা কল্পনাও করতে পারি না; ভীষম সাহনী, কৃষণ চন্দর, সাদাত হাসান মান্টোর সাহিত্যে বা 'ছিন্নমূল', 'তমস' আর 'গরম হাওয়া'-র মতো চলচ্চিত্রে তার একটা ছাপ কেবল ধরা আছে।

গোটা একটা প্রজন্ম সেই বিভীষিকার স্মৃতি নিয়ে বেঁচেছে। আজকের প্রজন্মকেও

১। Sumit Sarkar, *Modern India*, p 434

বহন করতে হচ্ছে তার উত্তরদায়। আমরা বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করি, ইতিহাসের এই রক্তকলুষময় অধ্যায়টিকে আজও ব্যবহার করা হয় পারস্পরিক দোষারোপ আর বিদ্বেষ প্রচারের কাজে। বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যবই থেকে বিশেষজ্ঞদের গবেষণাপত্রে—নানাভাবে ছড়ানো রয়েছে অসত্য-অর্ধসত্যে ভরা সাম্প্রদায়িক প্রচার; এই প্রচার ক্রমশই বাড়ছে।

বিকৃত ইতিহাস : প্রচারের বিকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা আজ যে ইতিহাস পড়ে, সেখানে বলা আছে—ক্যাবিনেট মিশন মুসলিম লীগকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের সুযোগ দিলেও লীগ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়; আর তা থেকেই শুরু হয়ে যায় কলকাতার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা।[১] যা বলা নেই, তা হল : মিশন প্রস্তাবে মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলির স্বাধিকার কিছুটা স্বীকৃত হলেও কংগ্রেস তা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি ছিল না; অন্য দিকে লীগ প্রথমে প্রস্তাবটা মেনে নিলেও তাকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। কংগ্রেসের 'অনমনীয়তা' আর ব্রিটিশের 'বিশ্বাসঘাতকতা'র যে অভিযোগ জিন্নাহ তুলেছিলেন, তা একেবারে মিথ্যে নয়।

আজ ঢাকার জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ইতিহাসের যে বই[২] অনুমোদন করেছে, সেখানে কলকাতা আর বিহারের দাঙ্গায় মুসলমান হত্যার কথা বলা হয়েছে; উল্লেখ করা হয়নি নোয়াখালিতে হিন্দু নিধনের কথা। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের পুরস্কারধন্য একটি পুস্তকে দেখি, নোয়াখালির ঘটনাকে হিন্দু পত্রপত্রিকার 'অতিরঞ্জিত' প্রচার বলেই কর্তব্য শেষ করেছেন লেখক।[৩] আর একটি গ্রন্থে, কলকাতার পর নোয়াখালি আর তার প্রতিক্রিয়াতেই যে বিহার, এই কালানুক্রমটিকে পর্যন্ত বিকৃত করে দিয়েছেন লেখিকা। একটি অধ্যায় শুরু হচ্ছে এই বলে : The Calcutta riots were followed by the still more terrible Bihar riots.[৪]

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের একটা বড় অংশ আজও মনে করে, ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গাচক্রটার জন্যে মুসলমানরাই কেবল দায়ী। অনুমান করি, বাংলাদেশের মুসলমানরাও একইভাবে দায়ী করেন হিন্দুদের। সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের প্রচার[৫] একইভাবে একটা

১। নমুনা হিসাবে নবম-দশম শ্রেণীর তিনটি পাঠ্যবইয়ের উল্লেখ করছি। লেখক— যথাক্রমে প্রভাতাংশু মাইতি, কিরণ চৌধুরী, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। শেষোক্ত বইটিতে বলা আছে, লীগ একাই অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে চেয়েছিল; সে দাবি অগ্রাহ্য হয় বলেই তারা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করে।

২। 'বাংলাদেশের ইতিহাস', জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৮৩-৮৪

৩। মহম্মদ আবদুর রহিম, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস', পৃ. ২৯৫

৪। Begum Shaista Suhrawardy Ikramullah, *Husyen Shaheed Suhrawardy*, p 58

৫। বাংলাদেশের পাঠ্যবইয়ে বরিশালের কথা আছে, নেই অশ্বিনী দত্তের নাম; চট্টগ্রাম আছে, নেই সূর্য সেন। পশ্চিমবাঙলার ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই জানে না লিয়াকত হোসেনের নাম—সেই লিয়াকত, যিনি 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে কলকাতার রাস্তায় গরিব ছাত্রদের জন্যে চাঁদা তুলতেন।

বিশেষ ছাঁচে ঢেলে দিয়েছে মানুষের মন। হিন্দুরা হিন্দু নিধনের কথাই বেশি করে বলেন মুসলমানরা শোনান কেবল মুসলমান হত্যার কাহিনী।

আজও পশ্চিমবঙ্গে প্রচারের ধারাটা এমন যে, অনেকেই বিশ্বাস করেন, মুসলমানরা পাকিস্তান চাইল বলেই দেশ ভাগ হয়ে গেল। তাদের জানা থাকে না যে, পাকিস্তানের আগে মুসলমানরা চেয়েছিলেন মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। সে অধিকার স্বীকার করা হয়নি বলেই, ওঠে পাকিস্তান দাবি। আর ওই অধিকার যে স্বীকার করা হয়নি, তার কারণ প্রথম থেকেই কংগ্রেসের মাথায় ছিল প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্র নিয়ে 'ইউনিটারি' ধাঁচের একটি রাষ্ট্রের ছক। এ ব্যাপারে তার প্রধান দোসর ছিল হিন্দু মহাসভা আর হিন্দু ব্যবসায়ীগোষ্ঠী।

শক্তিদম্ভ, স্বার্থলোভ

দেশভাগের ঘোষণা তখনও হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির একটি পুস্তিকায় ভবানী সেন লিখেছিলেন, 'স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়নকে আপনারা দুর্বল কেন্দ্র বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু মন্দের ভাল হিসাবে তাহার চেয়েও কি বঙ্গভঙ্গ ভাল'[১]?

বলতেই হবে হিন্দু কায়েমী স্বার্থ দুর্বল কেন্দ্রের চেয়ে বঙ্গভঙ্গকেই ভালো মনে করেছিল। ১৯৪৬-এর মে মাসেই জি ডি বিড়লার মনে হয়েছিল, দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী। পরবর্তী কালে সেই দাবিই তোলেন বণিকসভার প্রতিনিধিরা; দেশভাগ প্রস্তাবকে হিন্দু মহাসভা স্বাগত জানায়, কারণ এর ফলে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রবিশিষ্ট সরকার গঠিত হতে পারবে। আর স্বাধীনতা তখনও আসেনি, দেশভাগের সিদ্ধান্তটা শুধু হয়েছে, তখনই জওহরলাল সাফ জানিয়ে দেন, 'ভারতের কোন প্রদেশের স্বাধীনতা আমরা মানব না।[২] শক্তিশালী কেন্দ্রের দাবি থেকে হিন্দু স্বার্থ এক পা-ও সরতে রাজি ছিল না। এর জন্যে যতদূর যাওয়া দরকার যেতে তারা প্রস্তুত ছিল।

১৯২৯-এ এই কায়েমী হিন্দু স্বার্থই স্বীকার করেনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের দাবি। 'ফেডারেল' রাষ্ট্র আর প্রদেশগুলির স্বনিয়ন্ত্রণ চেয়ে এরপর যখন মুসলিম লীগ ১৪ দফা দাবি পেশ করে, তাও গৃহীত হতে পারে না হিন্দু স্বার্থের এই অনমনীয়তার কারণেই। ১৯৪৬-এর মিশন প্রস্তাব নিয়ে টালবাহানার পিছনেও কাজ করে এই স্বার্থই। আর তার জবাবেই আসে লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'—কলকাতার দাঙ্গা। স্বাধীনতার মাত্র কয়েকদিন আগে গান্ধীজী নাকি বলেছিলেন, লীগের ১৪ দফা

১। ভবানী সেন, 'বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান', পৃ. ১৩

২। G D Birla, *In the Shadow of the Mahatma*, p 286,
The Statesman, May 1, 1947, *Amrita Bazar Patrika*, June 5, 16, 1947

মেনে নিতে তিনি রাজি আছেন?[১] কিন্তু এই বোধ মহাত্মার এসেছিল বড় দেরিতে গঙ্গা-পদ্মার স্রোত বেয়ে অনেক রক্ত গড়িয়ে গেছে ততদিনে; দাঙ্গা-বিক্ষত মানুষের কাছে দেশভাগ হয়ে গেছে প্রায় নিয়তির মতো।

জিন্নাহ্ সম্পর্কে সাম্প্রতিক মূল্যায়নে কেউ কেউ বলেছেন, পাকিস্তান দাবি তোলার সময়ও দেশভাগের কোন স্থির পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ছিল না।[২] এ মত নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে; তবে কংগ্রেস মিশন প্রস্তাব মেনে নিলে দাঙ্গাটা এড়ানো যেত, এটা বোধ হয় বলা যায়। জিন্নাহর রাজনীতি নিয়ে অনেক প্রশ্নই তোলা যায়। ১৯৪০-এর লাহোরে প্রস্তাবে দুটি মুসলিমপ্রধান ইউনিটের কথা বলা হয়েছিল। 'পাকিস্তান' শব্দটি ছিল না। কিন্তু পরে মুসলিমপ্রধান প্রদেশে, বিশেষত বাঙলায়, স্বাধিকারচেতনা প্রবল হয়ে উঠছে দেখে ১৯৪৬-এর এপ্রিলে ওই প্রস্তাব সংশোধন করে একটি মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্রের কথা বলা হয়।[৩] সুতরাং জিন্নাহও মনে মনে 'ইউনিটারি' ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস মিশন প্রস্তাব মেনে নিলে, তখনকার মতো সংঘর্ষ এড়ানো যেত; পরে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলি হয়ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত; কিন্তু এত গণহত্যা, রক্তপাত ঘটত না। এটা যে শেষ পর্যন্ত হতে পারল না, জিন্নাহকে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিতে হল, সংঘর্ষের কথা বলতে হল, তার জন্যে অনেকটাই দায়ী কংগ্রেসের অনমনীয়তা। শক্তিশালী কেন্দ্রের দাবি সূচ্যগ্র ছাড়তে রাজি ছিল না কংগ্রেস।

আমাদের আলোচনায় আজও এটা প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, আজকের ভারতে অঞ্চলে-অঞ্চলে যে জাতিসত্তার আন্দোলন, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিবাদ, তার একটা বড় কারণ রাষ্ট্রের এই এককেন্দ্রিক বা ইউনিটারি গড়ন। আঞ্চলিক স্বাধিকারের, জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের যে কোন আন্দোলনকেই—আসাম-পাঞ্জাব-ঝাড়খণ্ড যাই হোক না কেন—এই রাষ্ট্র মনে করে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', সংহতিবিরোধী। স্বাধিকারকামী এইসব আন্দোলনকে সে একদিকে দমন করছে পুলিস-মিলিটারি দিয়ে, অন্যদিকে ক্রমাগত প্রচার করে যাচ্ছে নিজের স্বার্থে তৈরি করা সংহতি আর অখণ্ডতার তত্ত্ব। ভারতের বর্তমান এই রাষ্ট্রিক গড়নের মূল খুঁজতে হবে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের, বিশেষত ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়কার ইতিহাস থেকেই।

১। বদরুদ্দীন উমর, 'বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি', পৃ. ১০৩

২। Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman · Jinnah the Muslim League and the Demand for Pakistan*, pp 191-93
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জিন্না: পাকিস্তান—নতুন ভাবনা', পৃ. ১৬৯-৭০, ৩০০

৩। *Memoirs of H.S Suhrawardy*, ed by H R Talukdar, p22

অবজ্ঞা, অবিশ্বাস

হিন্দু স্বার্থের এই একরোখামির জবাব মুসলিম লীগ সেদিন দিয়েছিল মানুষ মারার এক হৃদয়হীন রাজনীতি দিয়ে। হিন্দুর চোখে মুসলমান সেদিন হয়ে গিয়েছিল এক 'ভয়ানক জাত'। গত চার দশক ধরে নানাভাবে পুষ্ট হয়েছে সে ধারণা; আর আজ একদিকে হিন্দু মৌলবাদীদের প্রচার, অন্যদিকে পাঞ্জাব-কাশ্মীরে পাকিস্তানি প্ররোচনা সেই মনোভাবটাকেই আরও শানিয়ে তুলছে। মুসলমানদের দেখানো হচ্ছে বিশ্বাসহন্তা, দেশদ্রোহী হিসাবে। এটা যে সম্ভব হচ্ছে, পাকিস্তানের দোষ যে ভারতের মুসলমানদের ঘাড়ে তুলে দেওয়া যাচ্ছে, তার একটা বড় কারণ, আমাদের ধারণায়, ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গা। কবে কোন্ বাদশা মন্দির ভেঙেছিলেন কি ভাঙেননি, সেই দূরের ইতিহাসটা আজ খুব প্রাসঙ্গিক নয় একজন হিন্দুর কাছে। কিন্তু যে স্মৃতি সে কিছুতেই ভুলতে পারে না, তা হল : দাঙ্গা। অসত্য-অর্ধসত্যে ভরা প্রচার আরও বিষিয়ে দিচ্ছে তার মন। পাশাপাশি রয়েছে মুসলিম কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনাও; তারাই ধরে রেখেছে ভারতের মুসলমানদের 'মুসলিম ভারতীয়' বলার রেওয়াজ।

মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে আজ আবদ্ধ হয়ে আছেন কয়েকটি অঞ্চলের গণ্ডীতে। বাঙলার যে সংস্কৃতি আমাদের গর্ব, তার ছাপ এই জনসমষ্টির ওপর তেমনভাবে পড়ে না। মৌলবাদীদের প্রচার, বাইরের প্ররোচনার প্রভাবই সেখানে প্রবল। ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান জিতলে তাই বাজি পোড়ে, পাকিস্তানের পতাকা তোলা হয় ওইসব অঞ্চলে। হিন্দু মনের মুসলমান বিরোধিতা আরও পুষ্ট হবার সুযোগ পায় তাতে। মুসলমানদের 'বিদেশী' বলে চিহ্নিত করে দেবার একটা সুযোগ পেয়ে যায় হিন্দু স্বার্থান্বেষীরা। মনে আছে, ১৯৮৭-র মীরাট দাঙ্গার পর কলকাতার এক জনসভায় এক মুসলমান সাংবাদিক আকুলভাবে বলেছিলেন, বিশ্বাস করুন, আমরা পাকিস্তানের লোক নই; আমাদের সামনে আছে হিন্দুস্থান, আর নয় তো কবরস্থান।

স্বাধীনতার পরপরই পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুর স্রোত, রাস্তার ফুটপাতে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাদের অসহনীয় জীবনযাপনের দৃশ্য যারা দেখেছেন, তাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় হিন্দু নির্যাতনের সেই মর্মন্তুদ কাহিনী। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বাংলাদেশে আজও আছে; বিরাম নেই উদ্বাস্তু স্রোতেরও। হিন্দুমনে এর যে প্রতিক্রিয়া, তার প্রকাশটা হয় অনেক সময়ই অমানবিক। স্বাধীন ভারতে একের পর এক দাঙ্গায় যখন মুসলমানদের হত্যা করা হয়, দেখা যায়, হিন্দুমনে তার ছাপ সেইভাবে পড়ছে না। অনেক সময় এমনও বলা হয় যে, এই রকম ব্যবহারই প্রাপ্য ছিল মুসলমানদের। এই কথা যিনি বলছেন, তিনি যে একেবারে অমানুষ হয়ে গেছেন এমন নয়; তার মনের ভেতর আসলে দগদগে হয়ে আছে ১৯৪৬-৪৭-এর স্মৃতি। এই স্মৃতির জোর এত প্রবল বলেই মন্দির-মসজিদ বিতর্কের মতো একটা উদ্ভট বিষয়কে নিয়ে আজ চাগিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে এক অস্বাভাবিক উন্মত্ততা।

অজ্ঞান উন্মত্ততা নয়, অমানুষিক উগ্রতা

১৯৪৬-৪৭-এর পুরো দাঙ্গাচক্রটা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি, দাঙ্গা সেই পর্বের রাজনীতির সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল; দুই পক্ষই দাঙ্গাকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছিল রাজনৈতিক স্বার্থে। গোটা বিষয়টাকেই ব্রিটিশের চক্রান্ত বলে দেখানোর যে ঝোঁক, আমরা তা পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছি না। চক্রান্ত নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল দুই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিরোধও; সাম্রাজ্যবাদ এর ভেতর থেকেই তার ফায়দা তুলে নিয়েছিল। কায়েমী স্বার্থই দাঙ্গা লাগিয়েছিল আর সাধারণ মানুষ তার হাতের পুতুল হয়ে দাঙ্গায় যোগ দিয়েছিল—এই সরলীকরণও আমরা মেনে নিতে পারি না। দাঙ্গার পিছনে একটা স্বার্থান্বেষী শক্তির মদত নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন দাঙ্গায় যোগ দিয়েছে, নিজের হাতে প্রতিবেশীকে খুন করেছে, তখন সেটা কেবল অজ্ঞান উন্মত্ততা বলা যায় না। তখন সেই সময়টুকুর জন্যে অন্তত তার মনে হয়েছে, আপন পরিবারের, ধর্মের, সম্প্রদায়ের স্বার্থে তার যা করণীয়, সে তাই করছে। তার এই চেতনার উৎসে আছে ভীষণ কঠিন নির্মম এক মতাদর্শ, যা গড়ে উঠেছে অনেক দিন ধরে, অনেক উপাদানের সমন্বয়ে।

চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে হিন্দু মহাসভার আহ্বানটা ছিল এরকম যে, বিজাতীয় স্পর্শে কলুষিত হয়েছে মাতৃভূমি; তাঁর সম্মানরক্ষার্থে ব্রতী হতে হবে হিন্দু যুবককে। বলা হত, আজ মসজিদের সামনে বাজনা বাজাতে দেওয়া হচ্ছে না; কোনদিন হয়ত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রাও। হিন্দুরা কি সহ্য করবে এই নিপীড়ন?[১] প্রচারের এই ভাষা স্বভাবতই স্পর্শ করেছিল হিন্দু যুবকের মন, বিশেষত বাঙলায়, যেখানে তখন চলছে মুসলিম লীগের শাসন। তার ধারণা হয়ে যায়, এই 'বিজাতীয়' শাসনে নষ্ট হতে চলছে তার শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম-সংস্কৃতি।

অপরদিকে মুসলমান যুবককে বোঝানো হয়েছিল, লীগের জয় মানে ইসলামের জয়, মুসলমানের মুক্তি। লীগ ক্ষমতায় থাকলে জমিদারি উচ্ছেদ হবে, গ্রামে স্কুল হবে। এই প্রচার সাধারণ মুসলমান চাষিকেও উদ্দীপিত করে, কারণ জন্মাবধি সে সহ্য করেছে হিন্দু জমিদারের অত্যাচার। লীগ যে মুসলমান যুবসমাজকে এতটা উদ্দীপিত করতে পেরেছিল, তার কারণ লাঞ্ছনা-অপমানের অভিজ্ঞতা মুসলমান মধ্যবিত্তেরও কম ছিল না। আমরা ভুলে যেতে পারি না মিনার্ভা থিয়েটারে কিশোর আলাউদ্দীনের বাজনা শুনে গিরীশচন্দ্র ঘোষের সেই উক্তি : 'নেড়েটাতো বেশ বাজায়।' এ কেবল প্রবীণ শিল্পীর কিশোর শিল্পীকে বাহবা দেওয়া নয়; এর পিছনে রয়ে গেছে বহুকালের পোষিত এক সংস্কার। আত্মগর্বী হিন্দু এক স্পর্ধিত উন্নাসিকতা নিয়ে ঘৃণা করেছিল মুসলমান সমাজকে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক যখন আসে, তার জবাব মুসলমানরা দেয় এক পাশব হিংসা প্রয়োগ করে। যে জাত নিয়ে হিন্দুর এত বড়াই, প্রাণে মারার চাইতে তার সেই জাত

১। Shyamaprasad Mukherjee, *Awake Hindusthan*, 1944, pp 89-90

নষ্ট করে দেওয়া, তার নারীর ইজ্জত নষ্ট করে দেবার বাসনাই তখন প্রবল হয়ে ওঠে মুসলমানের মনে।

দাঙ্গাকে আমরা সাধারণভাবে বাইরের প্ররোচনার ফল হিসাবেই দেখে থাকি। কিন্তু শুধু বাইরের উসকানি দিয়েই দাঙ্গা করা যায় না। ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গায়, লীগ দাঙ্গা শুরু করার পর হিন্দুরাও যে সমান পালটা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ কিছুকাল ধরেই হিন্দু মধ্যবিত্ত অনুভব করছিল, বাঙলায় তাদের আধিপত্য টলে যাচ্ছে। ১৯৪৩-এ এককভাবে সরকার গঠনের পর লীগও সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছিল।[১] ১৯৪৬-এর নির্বাচনের কয়েক মাস আগে (ডিসেম্বর, ১৯৪৫) কলকাতায় লীগের জনসমাবেশ রীতিমতো ভয় পাইয়ে দিয়েছিল হিন্দুদের। হাজার হাজার মুসলমান 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিয়ে মিছিল করে। সোহরাবর্দি ভাষণ দেন অক্টারলোনি মনুমেন্টের একেবারে চুড়ো থেকে। বোঝা যাচ্ছিল, লীগও সমানে সমানে পাল্লা দেবার মতো অবস্থায় এসে যাচ্ছে। নির্বাচনে লীগ বিপুল সংখ্যক আসনে জেতে; হিন্দু মধ্যবিত্তর আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। মুখোমুখি চ্যালেঞ্জের সামনে এসে পড়ে দুই সম্প্রদায়। মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করলে হিন্দুরাও তৈরি হতে থাকে ভেতরে ভেতরে। ১৯৪৬-এর গোড়াতেই শ্যামাপ্রসাদ ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'একটা civil war ছাড়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে না।' তাঁর স্পষ্ট মত : ভারতের প্রান্তে ইসলামের পতাকা উড়বে—এটা মেনে নেওয়া যায় না। ('শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি', পৃ. ৫৪, ৭৪)

তাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এবং তারপরে বিশেষত নোয়াখালির ঘটনার পর, দাঙ্গায় যোগ দেওয়াটা প্রায় নৈতিক কর্তব্য হয়ে যায় হিন্দু যুবকের চেতনায়। সেই রকম আহ্বানও পৌঁছে দেওয়া হয় তার কাছে : 'যে সকল পাপিষ্ঠ ভারতের পুণ্যভূমিকে পঙ্কিল করিতেছে, ... তাহাদিগের সমুচিত শিক্ষা যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা কর।' গীতার প্রতিধ্বনি করে বলা হয় : 'অহিংসতা হিন্দুর ধর্ম নহে, ইহা ক্লীবের প্ররোচনা।' ডাক দেওয়া হয় : 'হিন্দু জাগ ... হিন্দুকে রক্ষা কর।'[২] এই প্রচারে উদ্দীপিত হিন্দু যুবক নিজেকে সব্যসাচী অর্জুন ভাবে এবং ভ্রাতৃহত্যা তার কাছে ধর্মের স্বার্থেই কর্তব্য হয়ে ওঠে।

কলকাতা দাঙ্গায় এমন ঘটনাও ছিল যে, আজ যে দাঙ্গাপীড়িত মানুষের ত্রাণ আর উদ্ধারের কাজে যোগ দিয়েছে, কাল সে নিজেই দাঙ্গায় নেমে পড়েছে। হঠাৎ সে অমানুষ হয়ে গেল আর কয়েকদিনের জন্যে তাকে চালনা করতে থাকল এক অমানুষিক প্রবৃত্তি—এ রকম ধরে নিলে দাঙ্গা ব্যাপারটা আকস্মিক দুর্যোগ বলে মনে হয়; সমরেশ বসু-র 'আদাব' গল্পের শ্রমিকটি যেমন ভেবেছিল : 'কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা।'

কিন্তু দাঙ্গা মোটেই হঠাৎ নেমে আসা বজ্রপাত নয়। আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১। Ikramullah, *op cit*, p 45

২। 'হিন্দু' পত্রিকা, সম্পাদক : ভবতোষ রায়, অগাস্ট ২৪, ৩১, ১৯৪৬

যেমন ভেবেছিলেন—কলকাতায় কয়েক দিনের জন্যে 'দক্ষযজ্ঞের তামস রাত্রি' নেমে এসেছিল, তাই দিয়েও ওই ভয়ানক জটিল পরিস্থিতিটাকে ধরা যায় না; কারণ এই প্রশ্নটা রয়েই যায় : কেন নেমে এসেছিল তামস রাত্রি?

দাঙ্গাকে গুণ্ডা-ছোটলোকদের খুনোখুনি বলে চালিয়ে দিলে মধ্যবিত্তের একটা আত্মপ্রসাদ থাকে। দাঙ্গার পিছনে মধ্যবিত্তের মদতও যে থাকে, গোপন রাখা যায় এই অপ্রীতিকর সত্যটিও। অথচ প্রত্যক্ষদর্শীরা বলতে পারবেন, কলকাতা দাঙ্গায় মধ্যবিত্ত বাড়ির ছাদ থেকে ঢিল-পাথর এমন কি গুলি পর্যন্ত ছোঁড়া হয়েছিল, আর ব্যাপারটা মোটেই গুণ্ডা-বখাটেদের একচেটে ছিল না। নবেন্দু ঘোষের 'ফিয়ার্স লেন' উপন্যাস[১] থেকে একটি বর্ণনা তুলে দেওয়া যেতে পারে : 'সাত-আট বছরের ছেলে থেকে পঞ্চাশ বছরের বুড়ো মুসলমান পর্যন্ত ভিড় করে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে লাঠি আর বাঁশের টুকরো। গাড়ি আসছে, মোটর আর রিক্সা আসছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই "মার মার" শব্দ।' আর এর পাশেই রাখা যেতে পারে মণিকুন্তলা সেনের নিজ চোখে দেখা দৃশ্য : হিন্দু বাড়ির ছাদ থেকে মেয়েরা লাঠি জোগান দিচ্ছে—মুসলমানদের মারা হবে বলে।

শুধু আকস্মিক উন্মত্ততার তত্ত্ব দিয়ে এ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে রাখতে হবে, দাঙ্গার এক বিশেষ মনস্তত্ত্ব আছে, নানাভাবে তা পুষ্ট, পোষিত হয়। একটা গুণ্ডা যখন দাঙ্গা করে একটা অঞ্চলটাকে বাঁচায়, অঞ্চলের মানুষের চোখে সে তখন আর গুণ্ডা থাকে না। কলকাতার গুণ্ডাসমাজ নিয়ে একটি সমীক্ষায় ঠিকই বলা হয়েছে, ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গা বীরের আসনে বসিয়েছিল কলকাতার গুণ্ডাদের।[২] যে রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে নারীরা অনাত্মীয় পুরুষের সামনে বেরোয় না, তারাও সাদরে গুণ্ডাদের বাড়ির ভেতরে ডেকে খাইয়েছে।[৩] সেই নারীর চেতনায় সেই 'গুণ্ডা' তখন এমন এক পুরুষ যে তার ইজ্জত বাঁচিয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের ভাষায় ধর্মীয় প্রতীক, অনুষঙ্গের প্রয়োগও দাঙ্গাকে এক ধরনের মাহাত্ম্য দেয়। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বানে মুসলিম লীগ তাই বারবারই নিয়ে এসেছিল ইসলাম আর রমজানের প্রসঙ্গ। যুবসমাজকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছিল : 'পবিত্র কোরহানের নির্দেশ মেনে চলো। ইসলামের বিধান অনুসরণ করো।'[৪] বিহার দাঙ্গার পর লেখা হয় : 'সেই শহিদদের কথা মনে রাখ, যারা প্রাণ দিয়েছে ইসলামের

১। ছেচল্লিশের দাঙ্গা বাঙলা সাহিত্যের বেশ কয়েকটি রচনার বিষয় হয়েছে; যেমন, ছোট গল্প : রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি'; উপন্যাস : নবেন্দু ঘোষের 'ফিয়ার্স লেন', শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (২য় খণ্ড); তারাশঙ্করের 'উত্তরায়ণ'; ছায়াভিনয় : খালেদ চৌধুরী; পালা : ব্রজেন দে-র 'ধরার দেবতা', 'উজানীর চর'। ব্রজেন দে-র রচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রিনা ভট্টাচার্য। সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটিও প্রাসঙ্গিক।

২। Sabyasachi Mukherjee's article in *Cultural Profile of Calcutta*, ed. by Surajit Sinha, p 118

৩। ১৯২৬-এর দাঙ্গার পর এই ঘটনা দেখেছিলেন অতুল্য ঘোষ, 'কষ্টকল্পিত', পৃ. ১৪৩

৪। *Morning News*, August 5, 1946

জন্য। ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে দাঁড়িয়ে তারা আজ নিশ্চয়ই বলছে, হে ঈশ্বর, ওরা আমাদের মারল, কারণ আমরা তোমার বন্দনা করি ...।[১]

যে-কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে এই ভাষা। আর সে কারণেই সচেতনভাবে নিয়ে আসা হচ্ছে ধর্মীয় অনুষঙ্গ। তিলে তিলে বারুদ জমিয়ে এইভাবে তৈরি করে রাখা হচ্ছে মানুষের মন চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্যে, যাতে ডাক এলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নিঃসংশয়ে।

এই ঘটনাই প্রত্যক্ষ করি আমরা ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের দাঙ্গায়। যুদ্ধ-আকাল-মন্বন্তরের ভারে পীড়িত যুবসমাজ। হাতে কাজ নেই; বাজারে জিনিস নেই। চাল-কয়লার সংকট; কাপড়ের রেশন। ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ মানুষ, ভেঙে পড়েছে তাদের নৈতিক মনোবলও। যুদ্ধের আমলে গোরা সৈন্যরা প্রকাশ্য রাস্তায় মেয়েদের ধরে টানাটানি করেছে— দেখতে হয়েছে তাদের। দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ রাস্তায় শুয়ে না খেয়ে মরেছে, মেয়েরা দেহ বিক্রি করেছে—দেখেছে তারা। কালোবাজার আর চোরাচালানের চক্র গড়ে উঠেছে—চোরাপথে পাওয়া যাচ্ছে ভালো সিগারেট, দামী সেন্ট, লোভনীয় চকোলেট। এসবও জানা হয়ে গেছে তাদের। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিও আস্থা রাখতে পারছে না তারা। কলকাতার এক প্রবীণের ভাষায়, আমরা শুনতাম বিলেত থেকে সাহেবরা আসছে। কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে আলোচনা হচ্ছে; কিন্তু বারবার আলোচনা ভেঙে যাচ্ছে। অসহ্য লাগত আমাদের। ক্রমশ ক্ষুব্ধ হচ্ছিল যুবসমাজ।

এ অবস্থায় বিরাট একটা রাজনৈতিক অভ্যুত্থানেও যোগ দিতে পারত তারা; যেমন দিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ আর রসীদ আলী দিবসের আন্দোলনে।[২] ছেচল্লিশের ১৬ অগাস্ট তাদের হাতে এনে দিল আর এক ধরনের সুযোগ, অবরুদ্ধ ক্রোধের আর এক ধরনের প্রকাশ ঘটল; এক প্রমত্ত হিংসা নিয়ে শুরু হল পারস্পরিক খুনোখনি। বিদেশী শাসক নয়, ক্রুদ্ধ যুবকের কাছে প্রধান শত্রু তখন অপর সম্প্রদায়; মনে করা হচ্ছে, ওই সম্প্রদায়, ওই ভয়ানক জাতটাকে উচ্ছেদ করতে না পারলে যেন মুক্তি নেই;[৩] অস্তিত্বের স্বার্থে, আপন মর্যাদার স্বার্থেই তখন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে দাঙ্গা। তাই লাঠি-মুগুর, ছোরা-ছুরি হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে দাঙ্গায় নামল বেকার-বুভুক্ষু তথাকথিত গুণ্ডা-লোফারের দল; মদত পাওয়া গেল নেতাদের কাছ থেকে, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে; মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কাছ থেকে; যদিও তারাই মারল আর তারাই মরল বেশি করে। নৃশংসভাবে হত্যা করা হতে লাগল হাতের কাছে পাওয়া মুচি-মেথর, সহিস-

---

১। Quoted in English in Anita Inder Singh, *The Origins of the Partition of India*, p 199

২। ছাত্র-যুবকদের ওই বীরত্বময় আন্দোলনের সঙ্গে দুঃখজনকভাবে কিছুটা গুণ্ডামিও মিশে গিয়েছিল। 'পরিচয়', অগ্রহায়ণ ১৩৫২; *Amrita Bazar Patrika*, February 13, 1946

৩। যুবকরা কোন কোন ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল মনে হয়। পঞ্চানন ঘোষাল লিখেছেন, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর একজন দাবি করেছিল, সে ১০টা মুসলমানকে গিলে খেয়েছে। ('পুলিশ কাহিনী', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩)

কোচোয়ান, নাপিত-গোয়ালা আর ব্যাপারী-দোকানীদের। দাঙ্গা ছড়িয়ে গেল একটা অঞ্চল থেকে আর একটা অঞ্চলে; গোটা বছরটাই হয়ে গেল দাঙ্গার বছর।

কোন্ বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে, উদগ্র চেতনার কোন্ উত্তুঙ্গ মুহূর্তে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষও দাঙ্গায় যোগ দিতে পারে, তার কোন সাধারণ সূত্র নেই; আর, একটা দাঙ্গার সঙ্গে আর একটা দাঙ্গার ঘটনা তাই মেলে না। প্রতিটা দাঙ্গারই একটা বিশিষ্ট পটভূমি, একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। দাঙ্গার ইতিহাস খোঁজা মানে সেই বিশিষ্টতাকে খুঁজে বের করা।

১৯৯০-র অক্টোবরে অযোধ্যায় করসেবার নামে গোটা দেশকে যখন মাতিয়ে তোলা হচ্ছে এক উদগ্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায়, সেই সময়ই একদিন আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম মেটিয়াবুরুজের এক শ্রমিক বস্তিতে। আমরা বুঝতে চেয়েছিলাম মানুষের মনের ভাবটা, কি চোখে দেখছেন তাঁরা এই উন্মত্ততাকে। ঘটনাচক্রে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয় এক মুসলমান শ্রমিকের, যাঁর জন্ম অযোধ্যা যে জেলায় সেই ফৈজাবাদেই। বৃদ্ধ সেই শ্রমিকটি আমাদের বলেছিলেন, বাবরি মসজিদে তাঁরা কোনদিন নমাজ পড়েননি, ওটা নিয়ে তাঁর কোন আগ্রহও নেই। তবে মসজিদ ভাঙাটা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে।

এই যে মানুষটি, ইনি কোনদিন দাঙ্গা করবেন, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু মসজিদের ওপর আঘাত এলে সেই আঘাত তাঁর অন্তরের এমন একটা জায়গায় গিয়ে লাগতে পারে, যখন তাঁর মনে হতে পারে, স্ব-ধর্ম রক্ষার জন্যেই হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া উচিত। মানুষের মনের এই নিভৃত স্থানটির সন্ধান আমরা পাই না, স্বার্থান্বেষীরা এটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারে ধরতে পারি না, আর তাই দাঙ্গা আমাদের কাছে আকস্মিক মনোবিকার বা মনুষ্যত্বের সাময়িক বিলোপ বলে মনে হয়।

অথচ এটা ধরতে না পারলে মানুষ কেন দাঙ্গায় যোগ দেয়, কেন অপরের প্রাণ নেয়, কেন নিজের প্রাণ দেয়, তা বোঝা যায় না। 'তমস' চলচ্চিত্রের সেই দৃশ্যটির কথা স্মরণ করি। দলবেঁধে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে ইজ্জত রক্ষা করছেন শিখ নারীরা। এই সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছেন, কারণ তাদের মনে হয়েছে, ধর্মের স্বার্থে, শত্রুর কলুষ থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে আত্মবলিদানই তাঁদের কর্তব্য। 'তুরুক' তথা মুসলমানই তখন তাঁদের শত্রু। ওই উপন্যাসে ভীষম সাহনী লিখেছেন, গুরুদ্বারে গান শুনে সমবেত শিখ নারীপুরুষের মনে হচ্ছিল, তারা যেন তিনশ বছর আগের যুগে ফিরে গেছে, যে যুগে তুরুকদের সঙ্গে শিখদের যুদ্ধ হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকেই যেন 'শিখ ইতিহাসের দীর্ঘ শিকলে ... একটি গ্রন্থী। সে-ও যেন তার পূর্বপুরুষের মতো আত্মবলিদানের ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছে।' তার চেতনায় তখন ইংরেজ ছিল না, 'শুধু অস্তিত্ব ছিল তুরুকদের, অস্তিত্ব ছিল খালসাদের আর আগুয়ান যোদ্ধাদের। অস্তিত্ব ছিল আত্মোৎসর্গের সেই মহাযজ্ঞের যেখানে তারা প্রত্যেকেই নিজের প্রাণ আহুতি দেবার জন্যে তৈরি।'[১]

অনুমান করি, ১৯৪৬-এর ১৬ অগাস্ট সকালে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটে উপস্থিত মুসলমান যুবকের মনেও কাজ করেছিল এই চেতনাই। সে যখন হিন্দুর

১। 'তমস', অনুবাদ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৫২-৫৪

দোকান লুঠ করেছে, হিন্দুকে হত্যা করেছে, তার মনে হয়েছে এটা যেন ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদেরই অঙ্গ। অন্যদিকে হিন্দু যুবক যখন লাঠি-ছোরা নিয়ে তৈরি হয়েছে, সে ভেবেছে, এটা তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই প্রস্তুতি। এরপর দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলে হৃদয় বলে, বিবেক-ন্যায়নীতি বলে আর কিছু থাকেনি। তখন স্টেনগান এসেছে, বোমা এসেছে, অস্ত্রশিক্ষার অনুশীলন শুরু হয়েছে। অমানুষিক এক উগ্রতা তখন তার চেতনায়, যে চেতনা থেকে যাত্রীবোঝাই বাসের ওপর বোমা ফেলা যায়, নিরীহ পথচারীর গায়ে অ্যাসিড বালব ছুঁড়ে দেওয়া যায়; পাড়ার একটা বুড়ো ফলওয়ালা কি অসহায় জমাদারকে ছুরি মারা যায় শুধুমাত্র এই কারণেই যে, সে অন্য সম্প্রদায়ের, অন্য শিবিরের লোক। কলকাতার প্রবীণেরা কেউ কেউ বলেন, ১৯৪৬-৪৭-এ যা ঘটেছিল, তা ঠিক দাঙ্গা নয়, সিভিল ওয়র—গৃহযুদ্ধ। কিছু সত্য এই মন্তব্যে আছে মনে হয়।

*   *   *

দাঙ্গার ইতিহাস বড় ভয়ানক, কঠিন ইতিহাস। এই কাহিনী লেখা শেষ করে লেখকের মনে হয়, তার দুই হাত যেন রক্তে-ক্লেদে ভরে গেল। তার মনে তখন থেকে যায় একটাই প্রার্থনা : এরকম ঘটনা যেন আর কখনও না ঘটে। কিন্তু কে না জানে যে, প্রার্থনা দিয়ে বা শুভচিন্তা দিয়ে দাঙ্গাকে ঠেকানো যায় না। মৈত্রীর বাণী শুনিয়ে বা একটা দাঙ্গার পর শান্তি মিছিল বের করেও রোধ করা যায় না আর-একটা দাঙ্গার সম্ভাবনা। যে নির্বিবেক রাজনীতি মানুষের মনের একটা স্পর্শকাতর স্থানকে উত্তেজিত করে, তাকে দাঙ্গায় মাতিয়ে তোলে, দাঙ্গাকে তার চেতনায় কর্তব্য করে তোলে, সেই রাজনীতিকে শনাক্ত করা, যে মিথ বা অতিকথাকে অবলম্বন করে দাঙ্গার পরিস্থিতি রচনা করা হয়, সেই মিথটাকে ভেঙে দেওয়াই হতে পারে দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি।

সংযোজন

সেদিনের কলকাতার কয়েকটি স্মরণীয় দেয়াললিখন

'ধনীর কলহে গরীব গরীবের রক্তপাত করবে না
গরীব লড়বে তার পঞ্চায়েতী স্থানের জন্যে
পাকিস্তান ও অখণ্ড হিন্দুস্থান ধনীর ঝগড়া।'
'হিন্দুস্থান পাকিস্তান বড়োর স্বার্থে বড়োর দ্বন্দ্ব
গরীব সেথা মরে মারে
হায়রে গরীব এতই অন্ধ।'

বাটা মজদুর ইউনিয়নের একটি প্রচারপত্র

'আপন আপন মতের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া নিজেদের ঐক্য ও সংহতির বলে আমাদের গণতান্ত্রিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে আমরা বাঁচিয়া আছি পূর্বের মতই; অধঃপতিত হই নাই। নিজেদের বাঁচার ও কল্যাণের পথ গরীবরা নিজেরাই নির্দ্ধারণ করুক। বড়োর দেখানো পথে ধ্বংস ও পতন হইতে বাঁচুক।'

(সূত্র : জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি)

শান্তিসেনার প্রচারপত্র

'কোলকাতার জাগ্রত জনতার আগ্নেয় অস্ত্র—এই নিরস্ত্র শান্তিসেনাদল। জনতার বিপ্লবী প্রয়োজনে জনতার রণহুঙ্কারে ৪ঠা সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থান কোলকাতাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে পুনর্দখল করেছে। উদ্যত ছোরা-বোমা আর গুলিকে উপহাস কোরেছে। হিংস্র ষড়যন্ত্র চলছে মুনাফালোলুপ শোষকদের মধ্যে। তারা জ্বলে উঠবে—জ্বলে উঠছে। আবার তারা দাঙ্গা বাধাবে।
শান্তিসেনা সে দাঙ্গা রুখবে, গুঁড়িয়ে দেবে। জনতার জয় শান্তিসেনাকে অজেয় করে তুলবে।'

(সূত্র : সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ২য় খণ্ড)

যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে :

অংশুরাণী মিত্র, শহিদ শচীন্দ্র মিত্রর স্ত্রী।
অরুণ বসু, অধ্যাপক, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।
অজিত বসু, শ্যামবাজার।
অলোক ঘোষ, দাঙ্গায় নিহত হরেন ঘোষের পুত্র।
অশোক ঘোষ, চল্লিশের দশকের কমিউনিস্ট কর্মী।
অশোক ঘোষ, বেলগাছিয়া, বর্তমানে 'বিকাশ কেন্দ্র' সংগঠনের পরিচালক।
আবদুল রসীদ, ব্রাইট স্ট্রীট, পার্ক সার্কাস।
এ. ডবলিউ. মাহমুদ, অধ্যাপক।
এ. কে. মইদুল ইসলাম, তালতলা।
এস. চন্দ, শ্যামবাজার।
ইসা মিয়া, পাটোয়ারবাগান।
কমলাপতি রায়, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।
কে. পি. ঘোষ, কাউন্সিলর, রাজাবাজার; চিকিৎসক।
খালেদ চৌধুরী, শিল্পী।
গুণেন রায়, ভবানীপুর, বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী।
গোপাল আচার্য, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।
গোপাল মুখোপাধ্যায়, বউবাজার।
গোলাম কুদ্দুস, সাহিত্যিক।
জ্যোতি ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলেজ স্ট্রীট, যুব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
নিত্যগোপাল সাহা, শ্রমিক, তখন ঢাকায় স্কুলের ছাত্র।
নিত্যরঞ্জন সেন, প্রাক্তন শিক্ষক, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল।
নিমাইচাঁদ দত্ত, ফিয়ার্স লেন।
ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।
ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, খিদিরপুর।
বলাই দত্ত, কড়েয়া, পার্ক সার্কাস।
বিজয় ঘোষ, বউবাজার, ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
বিজয় সিং নাহার, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা।
বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রয়াত), ভবানীপুর।
বিশ্বনাথ দাস, শ্রমিক, খিদিরপুর।
বিরাজমোহন ঘোষ, শ্রমিক এন্টালি।
বিজন মিত্র, খিদিরপুর, যুব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বীরেন রায়, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শোভাবাজার।
মণি সান্যাল, ডেপুটি মেয়র, কলকাতা।
মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষিকা, তখন ফরিদপুর স্কুলের ছাত্রী।
মন্মথনাথ দত্ত, পাটোয়ারবাগান।
মীরা মুখোপাধ্যায়, টালা।
মুকুল ভট্টাচার্য, ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ছিলেন।
মৃত্যুঞ্জয় দে, ভবানীপুর, যুব-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
শিশির মিত্র, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।
শান্তি আচার্য, অধ্যাপিকা, তখন কলেজের ছাত্রী।
শেখ মানে আলম, শ্রমিক, খিদিরপুর।
শৈলেন মান্না, প্রবীণ ফুটবলার।
সন্ধ্যারানী (চট্টোপাধ্যায়), চিত্রাভিনেত্রী।
সুধী প্রধান, লেখক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অরুণ বসু, অঞ্জন ঘোষ, অরুণ দত্ত, কাজল মুখোপাধ্যায়, তরুণ বসু, দেবাশিস দাস, বিজয় বর্ধন, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সন্দীপ দত্ত, সুজাত ভদ্র।

উৎস মানুষ, জাতীয় গ্রন্থাগার, প্রিন্টিং সেন্টার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, বিধানচন্দ্র গ্রন্থাগার (মহাজাতি সদন), সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস।

উল্লিখিত রচনাপঞ্জি

অন্নদাশঙ্কর রায়, স্বাধীনতার পূর্বাভাস, কলকাতা, ১৩৮৬ব।

অমলেন্দু দে, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি, কলকাতা, ১৯৭৫।

অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চব্বিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব, পার্ল পাবলিকেশন্‌স, ১৯৮৯।

আবদুল মোহাইমেন, দুই দশকের স্মৃতি, ঢাকা।

আবুল কালাম সামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৬৮।

আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৭৫ সং।

কমলেশ সেন সম্পাদিত দাঙ্গাবিরোধী গল্প, রত্না প্রকাশনী, ১৯৯১।

কানাই বসু, নোয়াখালির পটভূমিকায় গান্ধিজী, কলকাতা, চৈত্র, ১৩৫৩ ব।

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি, কলকাতা, ১৯৪৭।

দীনেশচন্দ্র সিংহ, নোয়াখালির মাটি ও মানুষ, নির্মল প্রিন্টিং, ১৯৯২।

বদরুদ্দীন আহমদ, স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী, ঢাকা, ১৯৮৬।

বদরুদ্দীন উমর, বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, চিরায়ত, ১৯৮৭।

বীণা দাস, শৃঙ্খল ঝঙ্কার, সিগনেট, ১৯৪৮।

ভবানী সেন, বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান, সিপিআই, মে ১৯৪৭।

মণি সিংহ, জীবন সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৮৩।

মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, নবপত্র, ১৯৮২।

মেজর জয়পাল সিং, স্বাধীনতার ডাকে ব্রিটিশ আর্মি ত্যাগের ঝুঁকি নিলাম (বাঙলা অনুবাদ), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (এনবিএ), ১৯৮৯।

মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৬।

মৈত্রেয় ঘটক ও মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত 'বর্তিকা' পত্রিকা (বিশেষ তেভাগা সংখ্যা), জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), জেনারেল, ১৯৮২ সং।

সতীশ পাকড়াশী, অগ্নিযুগের কথা, নবজাতক, ১৯৮১।

সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা (২য় খণ্ড) এনবিএ, ১৯৮৬।

শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ : উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৮৮।

Azad, Abul Kalam, *India Wins Freedom*, Orient Longman, 1988.

Bandyopadhyay, Sandip, *Gandhiji's Non-Violence : The Noakhali Trial,* Frontier, 17 August, 1991.

Bose, N. K. *My Days with Gandhi,* Orient Longman, 1974.

Chatterjee, Partha, *Agrarian Relations and Communalism in Bengal* in

Subaltern studies Vol. I, ed by Ranajit Guha ; Oxford University Press (OUP), 1982.

Das, Suranjan, *Communal Riots in Bengal,* OUP 1991.

Gandhi, M. K. *The Way to Communal Harmony,* ed by U. R. Rao. Navajivan (Ahmedabad), 1963.

Hashim, Abul, *In Retrospection,* 1974.

Ikramullah Begum Shaista Suhrawardy, *Huseyn Shaeed Suhrawardy,* OUP (Karachi), 1991.

Ispahani, M.A.H., *Qaid-i Azam Jinnah : As I Knew Him,* Karachi, 1966.

Kripalani, Krishna, *Gandhi : A Life,* NBT 1982

Jalal, Ayesha, *The Sole Spokesman,* Cambridge University. Press, 1985.

Mansergh, N. ed. *Transfer of Power* Vols VIII–XI. 1979-80.

Menon, V.P. *The Transfer of Power in India,* 1957.

Mitra, N. ed. *The Indian Annual Register,* 1946-47

Moon, Penderel, *Wavell : The Viceroy's Journal,* OUP, 1973.

Mosley, Leonard, *The Last Days of the British Raj,* Jaico, 1965.

Mukherjee, S.P., *Awake Hindusthan,* Calcutta 1944.

Page David, *Prelude to Partition,* 1982.

Philips, C.H et al ed. *The Partition of India : Policies and Perspectives,* MIT Press 1970.

Pyarelal, *Mahatma Gandhi : The Last Phase,* 1958.

Ramanujan, *G., Story of Indian Labour,* Jaico 1968.

Rashid, Harun-or, *The Fore-shadowing of Bangladesh,* Dhaka, 1985

Saida, *A Nation Betrayed,* Delhi, October 1946.

Sarkar, Sumit, *Modern India,* Macmillan, 1983.

Savarkar, V.D, *Hindu Rastra Darshan,* Bombay 1948 edn.

Sen, Shila, *Muslum Politics in Bengal,* Impex, 1976.

Singh, Anita Inder, *The Origins of the Partition of India,* OUP, 1987.

Talukdar, H.R., *Memoirs of Huseyn Saheed Suhrawardy,* OUP, 1987.

Tendulkar, D.G, *Mahatma* Vol. VII, Govt. of India, 1969.

Tagore, Soumyendyanath, *Resurgence of Tribal Savagery in Calcutta,* Ganavani Publishing, September 1946.

পত্রপত্রিকা : অর্চনা, পরিচয়, প্রবাসী, বঙ্গশ্রী, হিন্দু, শনিবারের চিঠি। Amrita Bazar Patrika, Hindusthan Standard, Morning News, The Statesman, Searchlight.

উপন্যাস : নবেন্দু ঘোষ, ফিয়ার্স লেন, কলকাতা, ১৯৪৭।